এসএসসি প্রোগ্রাম : বাংলা প্রথম পত্র

গদ্য : প্রবন্ধ ও গল্প

প্রবন্ধকার ও গল্পকার

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

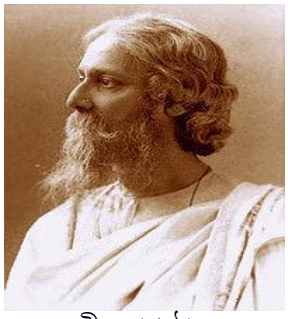
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমথ চৌধুরী

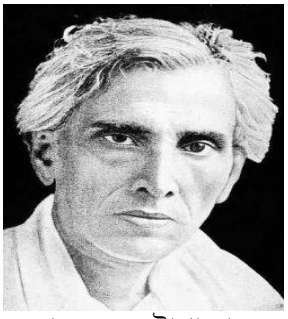
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বনফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

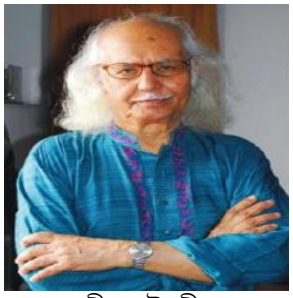
কবীর চৌধুরী

জাহানারা ইমাম

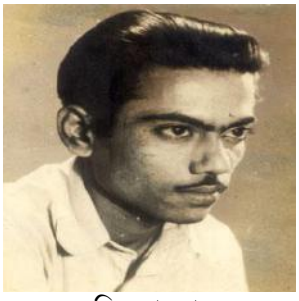
জহির রায়হান

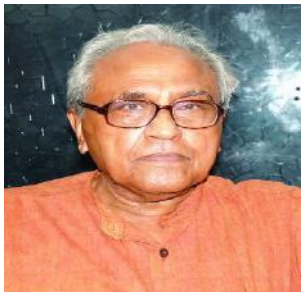
হায়াৎ মামুদ

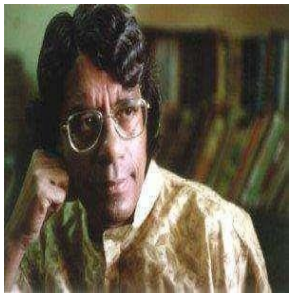
হুমায়ুন আজাদ

সাহায্য প্রয়োজন ?

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : chenggish@gmail.com এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল :meherin2010.bou@gmail.com

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁদের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হুগলির ডেপুটি কালেক্টর। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুর জেলা স্কুল ও হুগলি কলেজে পড়াশুনা করেন এবং নিজের চেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বর্ধমান কমিশনার অফিসে কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ভ্রমণসাহিত্যের লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভ্রমণকাহিনি 'পালামৌ' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'প্রমথনাথ বসু' ছদ্মনামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি বিহারের পালামৌ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। 'পালামৌ' ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সৌন্দর্যের প্রতি লেখকের যে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এমন বাঙালি লেখকদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এছাড়াও '*কণ্ঠমালা*' (১৮৭৭) ও '*মাধবীলতা*' (১৮৮৪) তাঁর দুটি উপন্যাস। '*জলপ্রতাপ চাঁদ*' (১৮৮৩) তাঁর ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থের নাম '*রামেশ্বরের অদৃষ্ট*' ও '*দামিনী*'। ১৮৮৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

'পালামৌ' রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*পালামৌ*' নামক ভ্রমণোপন্যাস থেকে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে। এ রচনায় লেখক বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের) পালামৌ অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য, দেশভ্রমণের আনন্দ, অভিজ্ঞতা এবং পালামৌ-এর আদিবাসী কোলদের জীবনাচরণ, খাদ্য ও আনন্দ-বিনোদন প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' পড়া শেষে আপনি–

- সাহিত্যরূপ হিসেবে ভ্রমণকাহিনির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা পালামৌ অঞ্চলের জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পালামৌ যাওয়ার পথের বিবরণ লিখতে পারবেন।
- পালামৌ অঞ্চলের পাহাড়-অরণ্য-শোভিত প্রকৃতির বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বাঙালি গৃহস্বামীর সংসার-ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই-এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে-চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন ইন্‌ল্যান্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির ডাকগাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানিগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। 'সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা।' এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

তাহাদের সঙ্গে একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশুও আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া-যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য কী?

অপরাহ্ণে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা যাইবেন?' আমি বলিলাম, 'একবার এই পর্বতে যাইব।' সে হাসিয়া বলিল, 'পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।' আমি এ-কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না-শুনিয়া আমি পর্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমতো সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনো সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসীর বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তথায় গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা। সেখানে তিন শত লোক থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধহয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধহয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিল যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর-একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, 'চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন।' এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর-একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ব মর্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে! লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে : কিন্তু আমি তাহা কোনোরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে 'কলাকাঁদির হিসাব' দেখিয়া বরং আরো চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি।

আমি ভাবিয়াছিলাম পালামৌ প্রবল শহর, সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। সেখানে একবার একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

এক কাঁদি সুপক্ব মর্তমান রম্ভা– এক ছড়া সুন্দরভাবে বা পরিপূর্ণরূপে পাকা কলা। ***কণ্টকাকীর্ণ–*** কাঁটায় পরিপূর্ণ; দুর্গম। ***কদাচারী–*** কুৎসিত বা জঘন্য আচরণ যার। ***কুসুমিত কানন–*** ফুলশোভিত বাগান; ফুলেল বাগান। **গণ্ডগ্রাম–** ক্ষুদ্র গ্রাম। **গাড়োয়ান–** গাড়ি চালায় যে। ***ডাকগাড়ি–*** ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ি; চিঠিপত্র বহনকারী গাড়ি। ***দ্রুতপদবিক্ষেপে–*** দ্রুত বা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাওয়া। **পরিসর–** ব্যাপ্তি; বিস্তার। **প্রকাণ্ড–** অতিবৃহৎ, বিশাল। ***প্রস্তরময়–*** পাথরের মতো। ***প্রসন্নতাব্যঞ্জক–*** আনন্দ বা সন্তুষ্টি প্রকাশক। **প্রত্যাগমন–** ফিরে আসা। **বাটী–** বাড়ি। **বিলক্ষণ–** ভালো রকম; অসামান্য। **মর্তমান–** এক জাতীয় কলা। ***মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ–*** ছোট টিলা; উঁচু জায়গা। **রম্ভা-** কলা। **শয়নঘর–** শোবার ঘর। ***সাদরে–*** আদরের সঙ্গে।

সারসংক্ষেপ :

লেখক যৌবনে পালামৌ প্রদেশে গিয়েছিলেন। পালামৌ পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা সুন্দর জায়গা। সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে সে পরিবেশ খুব একটা পরিচিত নয়। পথে যেতে যেতে যে পাহাড়কে খুব কাছে মনে হয়, সে পাহাড় আসলে অনেক দূরে অবস্থিত –এ অভিজ্ঞতাও লেখকের জন্য নতুন। যে বাঙালির বাড়িতে তিনি সেখানে অতিথি হয়েছিলেন, সে গৃহকর্তার প্রসন্ন মুখ আর তার পরিবার-ব্যবস্থাপনা লেখককে মুগ্ধ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কর্মজীবনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
ক. ডেপুটি জেল সুপার খ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
গ. ডেপুটি জজ ঘ. ডেপুটি পুলিশ সুপার

২. যে কারণে পর্বত সম্বন্ধে বাঙালির দূরত্ব স্থির করা কঠিন–
ক. শিক্ষার অভাব খ. অনভিজ্ঞতা
গ. বুদ্ধির অভাব ঘ. গণিতে দুর্বলতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পালামৌ' রচনার কোন নদীর সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. বরাকর খ. কালিনী
গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. কুশিয়ারা

৪. এই সাদৃশ্যের কারণ–
i. নদীটি অতিক্ষুদ্র ii. নদীতে অল্পমাত্র জল iii. নদীতীর বৃক্ষশোভিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i, ii ও iii ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়

পাঠ–২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পালামৌয়ের প্রধান জনগোষ্ঠী কোল সম্প্রদায়ের মানুষের সৌন্দর্য ও জীবনাচারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- পাহাড়ি কোল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বন বর্ণনায় যেরূপ 'শাল তাল তমাল, হিন্তাল' শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তা, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশি কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়; কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরো যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে-সেখানে দুই-একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে-প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে-প্রান্তর আরো রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনো দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকির পরিবর্তে এক-একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহবা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া

আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

এই অঞ্চলে প্রধানত কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! যে-সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ-বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটির। আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো। কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঙ্গালার পথেঘাটে বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনো কখনো চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে। লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধহয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠ ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে।

একদিনের কথা বলি। যেরূপ নিত্য অপরাহ্ণে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে।

যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, 'আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন মুখে আর জল গ্রহণ করি ?' আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।'

আমি স্বভাবত বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র-ভলুণ্ঢক সম্বন্ধে আমার কখনো ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারিরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনো গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম, বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনো আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবারি তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে এ-কথা তাহাদের মনে আইসে না। যতদিন তাহাদের মনে এ-কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভালো হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়।

একদিন অপরাহ্ণে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলো কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, 'রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?' আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা 'খোঁপা' বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই-তিনখানি কাঠের 'চিরুনি' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহবা লম্বা লাঠি

আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহ আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানাভঙ্গিতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারোটা, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো। সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল।

বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নতুন, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর এক বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চস্বরে গাহিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে 'ধুয়া' ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেইসঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি-একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে, দুই-তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরো কালো দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

অপরিচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অদ্যাপি– আজও; এখনো। **অনুসন্ধান–** খোঁজ করা। **অম্লান–** অমলিন; প্রফুল্ল। ***অশীতিপরায়ণা–*** আশির অধিক বয়স বিশিষ্ট বৃদ্ধা। **একশিলা–** পুরোটা একটি প্রস্তর। **কাষ্টঘণ্টা–** গৃহপালিত পশু খোঁজার ঘণ্টা। ***কোলবালক–*** কোল সম্প্রদায়ভুক্ত বালক। **কান্তি–** লাবণ্য; সৌন্দর্য। **খর্বাকৃতি–** বামন; বেঁটে। **গলঘন্টা–** গলায় বা কণ্ঠদেশে বাঁধা ঘণ্টা। ***জানু–*** হাঁটু। ***ধড়া–*** ধুতি; চীরবস্ত্র। ***ধুক্‌ধুকি– কণ্ঠহারের*** লকেট। **ধুয়া–** গানের যে অংশ দোহারগণ বার বার গায় (chorus)। ***পরগনা–*** অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টি। ***পাথুরে ছেলেগুলি–*** পাহাড়ি ছেলেগুলো সাধারণত কালো ও পরিশ্রমী হয়। ***পেনাল কোড–*** ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি। **প্রবিষ্ট–** প্রবেশ করেছে এমন। **বদন–** মুখমণ্ডল। **বয়োজ্যেষ্ঠা–** বয়সে বড় বা অধিক বয়স্ক নারী। **বীরদর্পে–** শক্তির সাথে; সাহসের সাথে। **মহড়া–** প্রস্তুতি; অভিনয়ের বা যুদ্ধের প্রস্তুতি। **মৃন্ময়–**মাটির তৈরি; মৃত্তিকা নির্মিত। ***যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে–*** পাহাড় এবং চারপাশের পরিবেশের ঘনত্ব বোঝাতে এ উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে; **রণক্ষেত্র–** যেখানে যুদ্ধ চলছে; যুদ্ধক্ষেত্র। ***লোলচর্মা–*** শিথিল বা ঢিলা চামড়া। ***শ্রমহেতু চিরযৌবনা–*** পাহাড়ি এই মেয়েরা পরিশ্রমী হওয়ায় সহসা বৃদ্ধ হয় না। ***সাতনরী–*** *সাত প্যাচের* কণ্ঠহার; গলার মালা। ***স্কন্ধ–*** কাঁধ ।

সারসংক্ষেপ :

লেখক পালামৌয়ে পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেখানকার প্রধান জনগোষ্ঠী কোলদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। এক প্রান্তরে কোল-বালকদের মহিষ চরাতে দেখলেন। কোল নারী-পুরুষও দেখলেন। সেই পরিবেশে, নিজেদের অঞ্চলে এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলোকেই তাঁর অতিশয় সুন্দর মনে হল। এক সন্ধ্যায় তিনি গিয়েছিলেন কোলদের নাচ দেখতে। ওই পাহাড়-বনের পরিবেশে রাতের আগুনের আলোয় কোল যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত নাচ-গান তাঁকে মুগ্ধ করল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'পালামৌ' অঞ্চলে কারা বাস করে?

ক. রাখাইন সম্প্রদায় খ. সাঁওতাল সম্প্রদায়

গ. মুণ্ডা সম্প্রদায় ঘ. কোল সম্প্রদায়

৬. 'পালামৌ' রচনায় লেখক কাকে 'সমদর্শী' বলেছেন?

ক. গৃহ শিক্ষককে খ. বাঘ মারতে উদ্যত কোল যুবককে

গ. কোল যুবতীকে ঘ. আতিথেয়তা দানকারী বাঙালিকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

লাওসে অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-পাটে অসংখ্য মেয়ে কাজ করে। তাদের পরনে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত স্থানীয় সুন্দর সিন, কাপড়ের তৈরি পোশাক অনেকটা লুঙ্গির মতো উর্ধ্বাঙ্গে শার্ট পরে।

৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত লাওসের মেয়েরা 'পালামৌ' রচনায় কোন নারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. মুরং খ. ওঁরাও

গ. মুণ্ডা ঘ. কোল

৮. উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. সমাজনীতিতে

ii. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে

iii. অর্থনীতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'পালামৌ' কীসের নাম?

ক. গ্রামের নাম খ. শহরের নাম

গ. পরগনার নাম ঘ. প্রদেশের নাম

১০. 'কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।'– কেন?

ক. বয়সের বাতিক খ. নিঃসঙ্গতা দূর করা

গ. পাণ্ডিত্য দেখানো ঘ. সামাজিক দায়িত্ব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সেবার শীতের ছুটিতে গেলাম চিম্বুক পাহাড় দেখতে। সেখানে গিয়ে উঠি আমারই বন্ধু সমীরণ চাকমার বাড়িতে। চাকমা পরিবারটির আন্তরিকতা, আপ্যায়ন ও ভালোবাসার প্রগাঢ়তায় পাহাড়ি জীবনধারার সৌন্দর্য আমার নিকট নতুনভাবে উদ্ভাসিত হল।

১১. উদ্দীপকে 'পালামৌ' রচনার যে পরিবারটির অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে–

ক. কোল পরিবার খ. মারমা পরিবার

গ. মুণ্ডা পরিবার ঘ. বাঙালি পরিবার

১২. উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার পরিবারটির সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. আতিথেয়তায় খ. ভ্রমণবিলাসে

গ. সংস্কৃতিচর্চায় ঘ. প্রকৃতিপ্রেমে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার পাহাড় আর টিলাগুলো যেন এক বিশেষ শ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। প্রথমেই দেখা যায় নিচুপাহাড়। তারপর উঁচু পাহাড়। তার উত্তরে আরও উঁচু পাহাড়ের সারি। শহর এ এলাকায় নেই বললেই চলে। এমনকি গণ্ডগ্রাম পাওয়াও দুষ্কর। এখানে আছে কেবল পাহাড় আর পাহাড় আর তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

ক. 'পালামৌ' লেখকের কোন ধরনের রচনা?

খ. 'মৃত্তিকার দুএকটি স্তূপ দেখলেই তাহাদের আনন্দ হয়।' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকটি 'পালামৌ' রচনার কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা এক ও অভিন্ন।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে অন্যতম মারমা সম্প্রদায়। মারমাদের জীবিকার প্রধানতম উপায় পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ করা। এরা উৎসবমুখর জনগোষ্ঠী। বর্ষবরণ উপলক্ষে মারমারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। সাংগ্রাই উৎসবে গান পরিবেশনের সঙ্গে নৃত্যেরও আয়োজন করা হয়। নৃত্য কখনো দলীয়, কখনো বা একক হয়। নৃত্যের সময় খোল, বাঁশি, করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজানো হয়। মারমা জনগোষ্ঠীর সকলেই এই আনন্দ-আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

ক. 'পরগনা' কী?

খ. 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকে 'পালামৌ' রচনার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মারমা ও কোল উপজাতির সাংস্কৃতিক জীবনধারা একইসূত্রে গাঁথা।" –উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'পালামৌ' একটি ভ্রমণবিষয়ক স্মৃতিচারণমূলক রচনা।

খ. উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর পাহাড় দেখার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

সমতল অঞ্চলের মানুষ সমতল মাঠ দেখে অভ্যস্ত। আমাদের পাহাড়-পর্বত দেখার সুযোগ তেমন একটা ঘটে না। কেবল উঁচু ঢিবি দেখেই আমরা আনন্দ অনুভব করি। আর পাহাড় দেখার সুযোগ পেলে তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। আলোচ্য রচনাটির লেখকও সমতল অঞ্চলের মানুষ। তাই 'পালামৌ' অঞ্চলে ক্ষুদ্র পাহাড় দেখে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকটির বিষয়বস্তু 'পালামৌ' রচনায় বর্ণিত পাহাড়ি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রকৃতি মানুষের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করে। এই আনন্দ পাওয়ার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির রাজ্যে। পাহাড়ও প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য মানুষের নয়ন ও মন দুটোই কেড়ে নেয়। ছোট-বড় নানা রকম পাহাড়ের বর্ণনা উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপরূপ প্রকৃতি উদ্দীপকের রাঙামাটি এবং পালামৌ উভয় অঞ্চলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

লেখক পালামৌতে গিয়ে সেখানকার পাহাড়-পর্বত দেখে অভিভূত হয়েছেন। সেখানে এত বড় পাহাড় রয়েছে যে নদী, আবাদি জমি, ঘর-বাড়ি কিছুই দূর হতে গোচরে আসে না। তাঁর কাছে সেখানকার পাহাড়গুলোকে বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ বলে মনে হয়েছে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রথমে নিচু পাহাড়, তার পরে উঁচু পাহাড় চোখে পড়ে। এলাকাটি যেন পাহাড়ে পাহাড়ে একাকার হয়ে আছে। পাহাড়ের সারি আকাশ আর মেঘকে দৃষ্টিসীমার বাইরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের এই অপূর্ব সমন্বিত অবস্থান 'পালামৌ' এবং উদ্দীপকের রাঙামাটি অঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ঘ. পাহাড়ের সারি ‘পালামৌ’ ও উদ্দীপকের রাঙামাটি অঞ্চলকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে বলে উভয়ের বর্ণনা এক ও অভিন্ন। পাহাড় দেখা আনন্দের শিহরণ জাগায়। উঁচু পাহাড় আর নিচু পাহাড়ের সৌন্দর্য মানুষ প্রাণভরে উপভোগ করে। মেঘের কোলে পাহাড় আর পাহাড়ের কোলে মেঘ এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির এই মোহময়তায় মুগ্ধ হয়েছে। উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনায় এমনই এক পাহাড়শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড় সারির বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পালামৌতেও দেখা যায় পাহাড়গুলো বিচলিত নদীর মতো তরঙ্গায়িত, শুধু স্তূপাকৃতির নয়। কোথাও কোথাও পাহাড়গুলো একশিলা, তবু কত বৃক্ষকে ধারণ করে আছে। নিয়মিত বৃষ্টিস্নাত হয় না বলেই সেখানকার পাহাড়গুলো পেয়েছে এক বিশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পালামৌতে লেখকের চোখে পড়েছিল শাল, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ। পালমৌর জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তার ছেদ নেই। লেখক সেখানে দেখেছিলেন পর্বত ছায়ায় রম্য অর্ধশুষ্ক একটি ক্ষুদ্র প্রান্ত যেখানে মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ব্যতীত আর কিছু নেই, সব জায়গা অতি পরিষ্কার।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার মনোলোভা বর্ণনা এবং ‘পালামৌ’-এর নান্দনিক উপস্থাপনা আমাদের কাছে মনে হয় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পাহাড়শোভিত উভয় অঞ্চলের চিত্রই আমাদের সমভাবে আকৃষ্ট করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড় ও ‘পালামৌ’-এর পাহাড়ের বর্ণনা যেন একসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

রাজধানী শহর ঢাকা ছাড়িয়ে শতাধিক কিলোমিটার উত্তরে পুরনো শহর ময়মনসিংহ। এ জেলার গারো পাহাড়ে বাস করে গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা। গারোরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এরা মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। গারো পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। এরা নারী-পুরুষ একসাথে মাঠে কাজ করে।

ক. পেনাল কোড কী?

খ. ‘যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী।’ –কেন?

গ. উদ্দীপক ও‘পালামৌ’ রচনার নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. “গারো সম্প্রদায়ের নারীদের চেয়ে কোল নারীরা অধিকতর জীবন সংগ্রামী।” –উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. ক ১১. ঘ ১২. ক

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

দেনাপাওনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

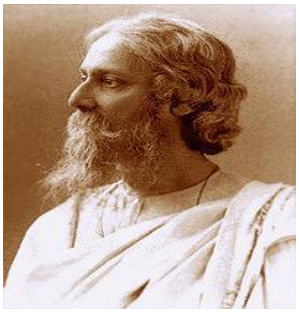

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কবিতা	:	*মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, শেষলেখা*;
উপন্যাস	:	*চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা*;
ছোটগল্প	:	*গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, গল্পসল্প*;
নাটক	:	*বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী*;
প্রবন্ধ	:	*আধুনিক সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, সাহিত্যের স্বরূপ*;
আত্মজীবনী	:	*জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা*।

ভূমিকা

'দেনাপাওনা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজে পণপ্রথার কুফল সম্পর্কে জানা যায় এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস উপলব্ধি করা যায়। লেখক গল্পটিতে যৌতুক নামক সামাজিক ব্যাধির এক নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন, যা যৌতুক গ্রহণকারীদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দেনাপাওনা' গল্প পাঠ শেষে আপনি–

- যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- নিরূপমার চরিত্র-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নিরূপমার বিয়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে নিরূপমা যেসব সমস্যায় পড়েছিল, তার বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরূপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল– গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরূপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন : এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।' রায়বাহাদুর বলিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।'

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব-একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।'

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, 'দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার ?' দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, 'শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।'

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরূপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা ?' রামসুন্দর বলিলেন, 'কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।'

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনো দিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান তো সহ্য হয় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, 'আহা কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।' শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, 'শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।'

এমনকি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, 'ওই ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ, বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানা স্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ব কেশে, শুষ্ক মুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' রামসুন্দর বলিলেন, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই– নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনুরাগ– আসক্তি; প্রীতি; সোহাগ; মমতা। **অন্তঃপুরে–** অন্দর মহলে। **আক্রোশ**– বিদ্বেষ; ক্রোধ; রোষ। ***খোঁটা***– গঞ্জনা; নিন্দা; দোষের প্রতি ইঙ্গিত। ***ঝংকার***– গুঞ্জন; বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ। ***তুমুল***– প্রবল; ঘোরতর; ভয়ানক। ***হতোদ্যম***– নিরুদ্যম; উদ্যমহীন। ***দয়াপরতন্ত্র***– দয়ার্দ্র; দয়ার বশীভূত। **দৈন্য–** দারিদ্র্য; অভাব। **নিত্যক্রিয়া**– দৈনন্দিন কর্ম; প্রতিদিনের কাজ। **নিরানন্দভাবে–** আনন্দ নেই এমন ভাবে; দুঃখিত চিত্তে। ***প্রতিপত্তি***– সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব। **বনেদী–**

সুপ্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। **বন্ধক–** ঋণের জামিনস্বরূপ কোনো বস্তু জমা রাখা। ***রায়বাহাদুর–*** ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব; রাজার মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি।

সারসংক্ষেপ :

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরূপমার বিয়ে হয়েছিল বড় ঘরে। দশ হাজার টাকা পণ এবং আরো বহু সামগ্রী দেওয়ার কথা ছিল। নিরূপমার বাবা টাকার জোগাড় করতে পারেননি। হবু বরের দৃঢ়তায় কোনোমতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পণের টাকা বেশিরভাগ বাকি থাকায় শ্বশুরবাড়িতে নিরূপমার অনাদর-অবহেলার সীমা ছিল না। বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া দূরের কথা, তাকে বাবার সাথে ঠিকমতো দেখাও করতে দিত না। তার বাবা টাকা জোগাড় করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু অতগুলো টাকা সংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১২ খ. ১৯১৩ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯১৫

২. 'ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।' এখানে ইতিহাস হলো–
ক. ক্ষতি স্বীকার করা খ. তিন হাজার টাকা সংগ্রহ
গ. দায়মুক্তির জন্য চেষ্টা ঘ. ঋণ করে খাওয়ানো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাপ যেমনি মেয়ের চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। আমার শ্বশুর মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

৩. উদ্দীপকের বাবা চরিত্রে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন ছবিটি ফুটে উঠেছে?
ক. বাৎসল্য খ. পণের অভাব গ. সন্তানের কষ্ট ঘ. বাবার সুখ

৪. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা 'দেনাপাওনা' গল্পের বাক্য হচ্ছে–
i. সংসারের খরচ আর চলে না।
ii. কন্যার সাক্ষাৎ লাভে বাপের বুক ফাটে।
iii. বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছেলের বিয়েতে পণ আদায়কারীদের জঘন্য মানসিকতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নোট-কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার অদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন; নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং

নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নতুন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।' এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'থাক, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না – কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সেসকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'সে এখন হচ্ছে না।' এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরূপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল– তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি –'। খুব একটা শক্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস ?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই।'

এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তাঁহার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?'

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, 'তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?' রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, 'দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?' নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া কহিল, 'পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?'

নিরূপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।'

রামসুন্দর বলিলেন, 'ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তাহলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।'

নিরূ কহিল, 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম ! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।'

রামসুন্দর কহিলেন, 'তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।'

নিরূপমা কহিল, 'না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।'

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরূপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশুড়ি বলিতেন, 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।' কখনো-বা বলিতেন, 'দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে, দেখো না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, 'ওর সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িতে বলিল, 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।'

শাশুড়ি বলিলেন, 'কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না– যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটি খ্যাতি রটিয়া গেল– এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনও দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব, এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, 'আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।' রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, 'বাবা তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– মৃতের সৎকার; অন্তিম অনুষ্ঠান। ***আজগুবি–*** অদ্ভুত; অবিশ্বাস্য। **ছল–** ছলনা। **দ্বাররক্ষী–** দারোয়ান; দরজায় পাহারারত কর্মচারী। **নতশির–** মাথা নিচু করেছে এমন, বিনয়ী। ***পঞ্জর–*** পাঁজর, বুকের হাড়ের খাঁচা। **প্রতিপত্তি–** সম্মান, মর্যাদা; প্রভাব। ***বন্দোবস্ত–*** ব্যবস্থা; আয়োজন। **ব্যামো–** ব্যাধি। **মর্মাহত–** মনে আঘাত পাওয়া। **রুষ্ট–** রাগান্বিত; ক্রুদ্ধ। ***শরশয্যা–*** মৃত্যুশয্যা। **সমারোহ–** জাঁকজমক; ঘটা। ***সরোদনে–*** কেঁদে কেঁদে। ***স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ–*** কৌতুহলবশত দুয়ারে কান পেতে যে অন্যের কথা শোনে।

সারসংক্ষেপ :

পণের টাকা বাকি ছিল ছয়-সাত হাজার। নিরূপমার বাবা রামসুন্দর অতি কষ্টে তিন হাজার টাকা জোগাড় করে কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গেলেন। শ্বশুর সে টাকা গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে রামসুন্দর বসতবাড়ি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করলেও বেঁকে বসল নিরূপমা। সে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে বাবাকে ফেরত পাঠাল। একথা শ্বশুরবাড়িতে জানাজানি হলে নিরূপমার উপর অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষে অনাদরে-অবহেলায় ও পীড়ায় নিরূপমার মৃত্যু হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অবশ্য মহাসমারোহে তার সৎকার ও শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. রামসুন্দর বিয়াই বাড়িতে কয়টি নোট এনেছিলেন?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৬. 'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারে নাই' –একথা বলার কারণ কী?

ক. বাবার অমতে বিয়ে করা খ. পণের টাকা নিতে রাজি না হওয়া

গ. মুখে মুখে কথা বলা ঘ. ধর্মীয় প্রথা না মানা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।" শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।" মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

৭. উদ্দীপকের মামার সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. শম্ভুনাথ খ. রায়বাহাদুর গ. রামসুন্দর ঘ. বিশ্বনাথ

৮. এই সাদৃশ্যের কারণ নিহিত রয়েছে–

i. মানসিকতায় ii. শিক্ষায় iii. অর্থলিপ্সায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন :

৯. ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ.বারীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. 'দেনাপাওনা' গল্পের অন্তর্নিহিত সুরটি কী?

ক. পুরুষতান্ত্রিকতা খ. নারী নির্যাতন গ. যৌতুকের ভয়াবহতা ঘ. কৌলীন্যপ্রথা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অরুণিমা বাপের বাড়ি থেকে লাখ টাকা আনতে পারেনি। তাই শ্বশুর বাড়িতে তার গঞ্জনার শেষ নেই। এমনকি ভরণ-পোষণেও সে অবহেলার শিকার। পড়শিরা যদি কেউ কিছু বলে অমনি শাশুড়ি মুখ ঝামটা মেরে বলে– 'ওই ঢের হয়েছে।'

১১. উদ্দীপকের অরুণিমার মধ্য দিয়ে 'দেনাপাওনা' গল্পে যার কথা বলা হয়েছে–

ক. নিরূপমা খ. অনুপমা গ. নিরূপমার মা ঘ. অনুপমার মা

১২. উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'দেনাপাওনা' গল্পের শাশুড়ির–

i. কটাক্ষ ii. নিষ্ঠুরতা iii. স্নেহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বিপাশার বিয়ে হয় প্রমথর সঙ্গে। কিন্তু প্রমথ বেকার। বিয়ের পর হতে অনেক দিন ধরে জামাইয়ের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছেন বিপাশার বাবা। এভাবে অনেক কটি বছর কেটে গেছে। একদিন সরকারি চাকরি পায় প্রমথ। চাকরিতে যোগ দিয়েই প্রমথ শ্বশুরের নিকট যৌতুক দাবি করে। প্রমথর বাবা বলেন, "আমার সরকারি চাকুরে সোনার ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিলে বৌয়ের শরীর সোনায় ভরিয়ে দেবে।" বিপাশা শিক্ষিত মেয়ে। অপমান সহ্য করতে পারে না সে। তাই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজে গড়ার অভিপ্রায়ে সে স্বামীর ঘর ছেড়ে নেমে আসে পৃথিবীর পথে।

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ কত টাকার পণ চেয়েছিল?

খ. 'বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।' –কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের যে বিষয়টিতে সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. "নিরূপমা প্রথার নিকট সমর্পিত কিন্তু বিপাশা আত্মসচেতন ও দ্রোহী এক নারী প্রতিমা।" –উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্ত বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

ক. কোথায় রামসুন্দরের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না?

খ. বিবাহ সভায় তুমুল গোলযোগ বেঁধে গেল কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের অমিলগুলো আলোচনা করুন।

ঘ. "দেনাপাওনা' গল্পের সামাজিক সমস্যা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ দশহাজার টাকা পণ চেয়েছিল।

খ. পাত্র পিতার অবাধ্য হয়ে বিয়ে করার দৃঢ়তা প্রকাশ করায় রায়বাহাদুর নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন বলে বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল। নিরূপমার বিয়েতে রায়বাহাদুর পণের দশ হাজার টাকা হাতে না পেলে বরকে বিবাহ আসরে না আনার জন্যে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। বর সহসা পিতার অবাধ্য হয়ে বলে উঠল, 'কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব'। ফলে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হয়ে বসে রইলেন। বিবাহ এক প্রকার নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল।

গ. 'দেনাপাওনা' গল্পে বর্ণিত যৌতুকপ্রথার নিষ্পেষণের দিকটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যৌতুকপ্রথা প্রতিটি সমাজেই একটি নিন্দনীয় দিক। যৌতুকপ্রথার অভিশাপে সমাজে অনেক নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যৌতুকপ্রথা নারীকে অবদমিত করে। উপরন্তু যৌতুকপ্রথা সমাজের মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়। উদ্দীপকে বিপাশা ও 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা এমনই এক অমানবিক প্রথার শিকার।

'দেনাপাওনা' গল্পে যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতার শিকার নিরূপমা ও তার বাবার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রামসুন্দর তার আদরের একমাত্র কন্যা নিরূপমাকে প্রভাবশালী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। বিবাহের সময়

রায়বাহাদুর দশহাজার টাকা নগদসহ অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসেবে দাবি করেন। এতে কন্যার বাবা রাজি হন। কিন্তু বিয়ের সময় নগদ অর্থ কিছু বাকি পড়ে যায়। ফলে শুরু হয় নিরূপমার উপর মানসিক নির্যাতন। নিরূপমার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় গল্পটির কাহিনি। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের বিপাশাও পণপ্রথার শিকার হয়েছে। বিপাশার শিক্ষিত বেকার স্বামী সরকারি চাকরি পাওয়ায় তার স্বামী ও শ্বশুর যৌতুক দাবি করে। পীড়নের শিকার হয় বিপাশা। শ্বশুরবাড়িতে মানসিক পীড়নের কারণে একসময় তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়। বস্তুত যৌতুকপ্রথার ভয়াবহ ও অমানবিক নির্যাতনের দিকটিই উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ. উদ্দীপকে বিপাশা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজছে।

আমাদের দেশে যৌতুকপ্রথার শিকার হয় অসংখ্য নারী। অনেক সময় তারা পিতার দরিদ্রতা ও শ্বশুরবাড়ির ভয়াবহ নির্যাতনের কারণে পরিবারে অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে এদেশের নিরূপায় গৃহবধূরা আত্মবিসর্জনের সহজ পথটি বেছে নেয়। তবুও এই সমাজ ও সংস্কৃতিতে যৌতুকপ্রথার অপ্রতিরোধ্য গতি রুদ্ধ হয় না ।

'দেনাপওনা' গল্পে রামসুন্দর কন্যাবৎসল পিতা। যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুর বাড়িতে কন্যার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তাকে সর্বদা পীড়িত করত। তাই সে বাড়ি বিক্রি করে যৌতুকের টাকা জোগাড় করে। নিরূপমা পিতার অপমান ও সর্বস্বান্ত অবস্থা সহ্য করতে না পেরে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে বিপাশার বিয়ে হয় শিক্ষিত বেকার যুবক প্রমথের সাথে। সরকারি চাকরি পাওয়ার পর বেঁকে বসে প্রমথ ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবিতে প্রমথ অতিষ্ঠ করে তোলে বিপাশা ও তার পরিবারকে। কিন্তু পরিণতিতে নিরূপমার মতো বিপাশা আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয় না। বিপাশা আত্মপ্রত্যয়ী নারী। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একসময় সে স্বামীর ঘরও ছেড়ে দেয়।

উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পে বিপাশা ও নিরূপমা যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতার শিকার। আমাদের সমাজে তারা চরম অসহায় অবস্থায় নিপতিত। তারা না পারে যৌতুকের ব্যবস্থা করতে, না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে পরিবারের দুঃখ দূর করতে। তারা শুধু পারে আত্মবলি দিতে। দিতে পারাটাই যেন মুক্তির একমাত্র পথ। এভাবে 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমা মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে আত্মবির্সজনের পথ বেছে নেয়। সে নিজেকে পণপ্রথার নিকট সমর্পণ করে। কিন্তু উদ্দীপকের বিপাশা ভিন্ন ধাতুতে গড়া নারী। সে প্রচলিত পণপ্রথাকে ঘৃণা করেছে। শ্বশুরবাড়ির মানসিক নিপীড়নকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পৃথিবীর পথে নেমে এসেছে। বিপাশা নিজের ভবিষ্যৎকে নিজে গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। অতএব বলা যায়, 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা সামাজিক প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে; কিন্তু বিপাশা প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেনি। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের প্রত্যয়ী অবস্থানকে তুলে ধরেছে। সমাজে প্রচলিত অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন না হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবাতো ভাল করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

ক. 'রায় বাহাদুর' কাদের বলা হত?

খ. 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' –কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শ্বশুর 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "'দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্র যেন উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটিকেই তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. খ

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামে। কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন, ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বিএ ও ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে আসলেও তিনি সে-পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি। প্রমথ চৌধুরী নিজেকে প্রধানত সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯১৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা কথ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে তাঁরই হাতে। এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান খ্যাতি মননশীল প্রবন্ধলেখক হিসেবে। শাণিত যুক্তি, আলঙ্কারিক ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত তীর্যক ভঙ্গি এবং চলিত রীতির সঙ্গে স্যাটায়ার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নতুন গদ্যধারার জন্ম দেন তিনি। এ রচনার ধারাই 'বীরবলী' গদ্যের ধারা নামে পরিচিত। প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য রচনা :

প্রবন্ধ গ্রন্থ	:	*তেল-নুন-লাকড়ি, বীরবলের হালখাতা, আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা*;
গল্প গ্রন্থ	:	*চার ইয়ারি কথা, আহুতি*;
কাব্য	:	*সনেট পঞ্চাশৎ*।

ভূমিকা

একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় পঠিত 'বইপড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। সমাজকে সভ্য ও প্রগতিশীল করতে হলে সাহিত্যচর্চার যে কোনো বিকল্প নেই তাই প্রবন্ধকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রবন্ধে প্রগতিশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে বই পড়ার উপযোগিতা, আবশ্যকতা, পাঠকের মানসিকতা ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা লেখক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'বই পড়া' প্রবন্ধ পড়া শেষে আপনি–

- দেহের পাশাপাশি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জাতীয় উন্নতির দীর্ঘমেয়াদী নিয়ামক হিসেবে বইপড়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বই পড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না; কেননা, আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন; কেননা, আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে। কেননা, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনিই যাই বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা, তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা, কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভান্ডার যে ধনের ভান্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা, মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

অতএব, দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত ও ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত্ব-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবগাহন– সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল। ***আবহমানকাল–*** চিরকাল। **উত্তরসাধক–** পরবর্তীকালের সাধক বা সহায়ক। ***উদ্বাহু–*** ঊর্ধ্ববাহু; আহ্লাদে হাত উঠানো। ***উপায়ান্তর–*** অন্য কোনো উপায়। ***জজ–*** বিচারক। ***ডেমোক্রেসি–*** গণতন্ত্র। **নিরর্থক–** অর্থহীন। ***প্রচ্ছন্ন–*** আবৃত বা ঢাকা। **প্রত্যক্ষ–** স্পষ্ট; দৃষ্ট। ***ভাঁড়ে ভবানী–*** রিক্ত; শূন্য। **মহাভ্রান্তি–** ভীষণ ভুল ধারণা। **মাহাত্ম্য–** মহিমা; গৌরব। **রিপোর্ট–** আইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন। **লাইব্রেরি–** পাঠাগার; গ্রন্থাগার; পুস্তকাগার। ***শৌখিন–*** রুচিবান। ***সন্দিহান–*** সন্দেহযুক্ত। ***সোল্লাসে–*** উল্লাসসহ; সানন্দে। **সংক্রামক–** ছোঁয়াচে; সংস্পর্শে উৎপন্ন। ***স্বশিক্ষিত–*** নিজে নিজে শিক্ষিত।

সারসংক্ষেপ :

বই পড়ায় নগদ লাভ হয় না; কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির মনের বিকাশের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। অন্য অনেক বাস্তব জ্ঞানের বইয়ের তুলনায় সাহিত্যেই মনের বিকাশ ভালো হয়। কারণ, সাহিত্যেই মানুষের জীবনের সার্বিক চিত্রটা ধরা পড়ে। বই পড়ার জন্য দরকার লাইব্রেরি। শরীরের চিকিৎসার জন্য যেমন হাসপাতাল দরকার, মনের বিকাশের জন্যও তেমনি লাইব্রেরি প্রয়োজন। লাইব্রেরিতে মানুষ নিজের আনন্দে স্বেচ্ছায় বই পড়ে। এরকম স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই কেবল মানুষ সুশিক্ষিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বীরবল' কার ছদ্মনাম?

ক. প্রমথ চৌধুরী　　খ. গৌরাঙ্গ চৌধুরী

গ. বিষ্ণু চৌধুরী　　ঘ. অমিয় চৌধুরী

২. ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমরা কিসের দোষগুলো আয়ত্ত করছি?

ক. পরিবারতন্ত্রের　　খ. রাজতন্ত্রের

গ. গণতন্ত্রের　　ঘ. অভিজাততন্ত্রের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ডা. রুহুল আমিন দোকানে গিয়েছিলেন চিকিৎসাসংক্রান্ত কয়েকটি বই কিনতে। কেনাকাটা শেষ হলে কর্মচারী তাকে বললেন, "ইলিয়াড-এর একটি নতুন সংস্করণ এসেছে, নেবেন স্যার?"। ডা. আমিন মুখ বাঁকা করে বললেন, "ওসব কাব্য-টাব্য পড়ে কী লাভ? সময়ের অপচয়মাত্র।"

৩. উদ্দীপকের ডা. আমিন 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে তুলে ধরে?

ক. আইনজীবী খ. শিক্ষক

গ. খেলোয়াড় ঘ. ব্যবসায়ী

৪. উদ্দীপকের চরিত্র ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

i. সাহিত্যের নগদ বাজার দর নেই ii. সাহিত্যচর্চা ব্যয়বহুল iii. সাহিত্য পাঠে পুণ্য হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ–২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্কুল-কলেজের জবরদস্তিমূলক শিক্ষার কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় বিকাশের জন্য লাইব্রেরির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস ও–বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে যে বেয়াড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়াতে, হাতপা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা শাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers ; অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায়নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে তারা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারাও লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এ জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলেই মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফুর্তিলাভ করে না; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতির নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অব্যাহতি– মুক্তি। **উত্তরোত্তর–** ক্রমান্বয়ে; পরপর। **উদ্‌গীরণ–** বমিকরণ; ঢেকুর তোলা। ***উদরপূর্তি–*** পেট ভরানো। ***এথেন্স–*** গ্রিসের রাজধানী। ***কেতাবি–*** কেতাব অনুসরণ করে চলে যে বা যারা। ***কারদানি–*** বাহাদুরি। ***গতাসু–*** মৃত। ***গলাধঃকরণ–*** গিলে ফেলা। **জগদ্বিখ্যাত–** পৃথিবী বিখ্যাত; জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ***জীর্ণ–*** হজম। ***ডেমোক্রেটিক–*** গণতান্ত্রিক। ***দাতাকর্ণ–*** মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র; কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ। ***ধান ভানতে শিবের গীত–*** অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। **নিষ্পেষিত–** সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করা হয়েছে এমন। **প্রত্যাখ্যান–** উপেক্ষা; গ্রহণ না করা। **বাজিকর–** জাদুকর; ঐন্দ্রজালিক। **বেয়াড়া–** অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন; একরোখা। **মনস্তুষ্টি–** মনের সন্তোষ; চিত্তের তৃপ্তি। **মন্দাগতি–** ধীর বা মন্থর গতি। **যকৃত–** কলিজা। **রেজিস্টারি–** সরকারি বইতে বা খাতায় নামাদি লিখন; নিবন্ধন। **শাস্ত্রী–** শাস্ত্রে বা যে কোনো বিশেষ বিদ্যায় পণ্ডিত; শাস্ত্রজ্ঞ। **স্বচ্ছন্দ–** নিজ ইচ্ছামতো; অনায়াস। **স্ফূর্তিলাভ–** উৎফুল্লতা।

সারসংক্ষেপ :

আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা গেলানোর চেষ্টা করা হয়। এতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। বরং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বশিক্ষিত হবার যে ক্ষমতা থাকে, তা নষ্ট হয়। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষায় পাশ করা আর অর্থ উপার্জন হতে পারে না। বহু মানুষের মনের বিকাশ জাতির যে মানসিক জাগরণ ঘটাতে পারে, জাতির উন্নতির জন্য তার মূল্য অনেক বেশি। এ কারণেই স্কুল-কলেজের চেয়ে লাইব্রেরি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধা-ধরা শিক্ষা মনকে নির্জীব করে। অন্যদিকে, সাহিত্যচর্চায় মন সজীব ও সতেজ হয়। তাই নগদ প্রাপ্তি কম হলেও জাতীয় প্রগতির জন্য সাহিত্যচর্চার প্রসার দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'কারদানি' মানে কী?

ক. কারবার পদ্ধতি খ. করসংক্রান্ত বিষয় গ. বাহাদুরি ঘ. পরিশ্রমী

৬. কীভাবে শিষ্যকে বিদ্যার সাধনা করতে হয়?

ক. নিজ চেষ্টায় খ. বই পড়ে গ. গুরুর চেষ্টায় ঘ. নোট পড়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

প্লেটো, এ্যারিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সনদধারী ছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে এ সকল মনীষী প্রাতঃস্মরণীয়।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যটির মিল রয়েছে–

ক. শিক্ষা পদ্ধতি তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে নি।

খ. পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।

গ. গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

ঘ. আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না।

৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের মন্তব্য ও উদ্দীপকের মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. নিয়মের বাইরে শিক্ষিত

ii. স্বশিক্ষায় শিক্ষিত

iii. সুশিক্ষায় শিক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'গতাসু' শব্দের অর্থ কী?

ক. মৃত খ. মরণশীল গ. গতানুগতিক ঘ. গতকাল

১০. প্রমথ চৌধুরীর মতে শিক্ষকের কাজ হল–

i. বিদ্যা দান করা ii. মনের সক্ষমতা বাড়ানো iii. নতুন তথ্য জানানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আদৃতা অনিবার্য কারণে স্কুলে যেতে পারে না। তাই তার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হয়ে উঠে না। সে বাসায় বসে নিজেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। কারণ সে জেনেছে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

১১. আদৃতার নিজে পড়ার আগ্রহ যে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়–

ক. লাইব্রেরী খ. বইপড়া গ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ. রচনার শিল্পগুণ

১২. উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধে যে বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে–

ক. ধর্মীয় শিক্ষা খ. নৈতিক শিক্ষা গ. স্বশিক্ষা ঘ. কারিগরি শিক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারাদি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া আবশ্যক।

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর কোন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে?

খ. 'সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব নয়, খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে মাত্র।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বই কেনার সামর্থ্য নেই। তবুও বিভিন্ন বন্ধুর নিকট থেকে বই সংগ্রহ করে পড়ে পায়েল। সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা, আত্মজীবনী, দর্শন– জ্ঞানজগতের সকল প্রদেশে তার যাতায়াত থাকা চাই। অন্য দিকে তার বন্ধু কাকলি বই কিনে বন্ধুদের উপহার দেয় কিন্তু নিজে খুব একটা পড়ে না। তার ধারণা এসব বই পড়ে কী হবে? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট।

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে লেখকের মতে গ্রামে গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করা উচিত?

খ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের পায়েল 'বই পড়া' প্রবন্ধের একটি বিশেষ চিন্তার ধারক।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে সংকলন করা হয়েছে।

খ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বিশ্বাস করেন শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না– এজন্য তিনি উক্তিটি করেছেন।
পৃথিবীতে বস্তুগত ও ভাবগত সকল বিষয়েরই আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত আছে। তবে শিক্ষা এমন একটি ব্যাপার যা কখনো বিনিময় করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক বড়জোর শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করতে পারেন, কিন্তু শিক্ষিত করে তুলতে পারেন না। এটা নিজস্ব চর্চা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নিতে হয়। একারণেই প্রাবন্ধিক মন্তব্যটি করেছেন।

গ. শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়– 'বই পড়া' প্রবন্ধের এই বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানুষের মানব সত্তা বিকাশের জন্য বই পড়া অপরিহার্য। বই মানুষের মানব সত্তা বিকাশে সহায়ক। বই পড়লে মানুষ শিক্ষিত হয়। এ জন্য শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। আর এই শিক্ষা নিজের চেষ্টাতেই অর্জন করতে হয়। অন্য কথায় বলা যায়, সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাল্যকাল হতে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংযোগ নেই। আমরা কেবল যেটুকু আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই কণ্ঠস্থ করি। এতে আমাদের কোনোমতে কাজ চলে যায় মাত্র। তাতে কোনোক্রমেই মনের বিকাশ সাধিত হয় না। শিক্ষাকে রীতিমত হজম করতে হলে অনেক অপাঠ্য পুস্তককে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে হজম করতে হয়। 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অ-পাঠ্যপুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমরা জাতি হিসাবে সৌখিন নই বলে শখ করে কেউ বই পড়ি না। ফলে আমরা শিক্ষার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই না। আমাদের অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাদের ধারণা বিদ্যাপীঠ থেকে ছেলে-মেয়েরা এমন পরিমাণ বিদ্যা অর্জন করবে যাতে ভাবীকালের সময়টা ভালোভাবেই কেটে যাবে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করে না।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি সভ্য ও শিক্ষিত জাতির ভিত নির্ভর করে তার উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার উপর। তাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষা অর্জিত হবে আনন্দের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের বই গিলিয়ে নয়।

'বইপড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, জোর করে কাউকে শিক্ষিত করা যায় না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। শিক্ষা মানুষকে অর্জন করতে হয় আনন্দের সঙ্গে। স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য মানুষকে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অনেক পাঠ্য-বহির্ভূত পুস্তকও পড়তে হয়। কিন্তু আমরা শিক্ষার ফলটা হাতে হাতে পেতে চাই। আমরা ধারণা করি বিদ্যাপীঠে পাঠিয়েই শিক্ষার্থীদের বিদ্যা অর্জন সারা হয়ে গেল। এই বিদ্যার জোরেই তারা বাকিটা জীবন আরাম-আয়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নেই যদিও বাল্যকাল হতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করি। এতে কোনোমতে কাজ চলে মাত্র কিন্তু ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না। উদ্দীপকে আরো বলা হয়েছে হাওয়া খেলে মানুষের পেট ভরে না কিন্তু খাবারকে হজম করার জন্য হাওয়ার প্রয়োজন।

শিক্ষা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ না করলে শিক্ষা সার্থক হয় না। এই বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আর উদ্দীপকে বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি, খণ্ডিত অংশকে তুলে ধরেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিত তবে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।

ক. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িকপত্রের নাম কী?

খ. 'এ আশা সম্ভবত দুরাশা।' –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. 'উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না।' –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. খ ১২. গ

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

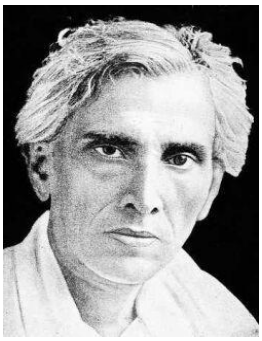

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। তিনি জীবনের প্রথম দিকে একটি জমিদারি এস্টেটে সামান্য চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯০৩ সনে তিনি সমুদ্র পথে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। ১৯১৬ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ অঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *বড়দিদি, পরিণীতা, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত (৪ পর্ব), গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন*;

গল্প গ্রন্থ : *মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, হরিলক্ষ্মী, বিলাসী, মামলার ফল*।

ভূমিকা

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই গল্পটিতে সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্ববোধ, সমাজে প্রচলিত কার্যপ্রথা, জাতবিভেদ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দৃষ্টান্তের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উঁচু জাতের হিন্দু পরিবারের মৃতের সৎকারে আড়ম্বর, সামন্ত প্রভুদের নির্মমতা এবং নিচু শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের জীবন-যন্ত্রণা সম্পর্কে লেখক হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনা দিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'অভাগীর স্বর্গ' গল্প পাঠ শেষে আপনি–

- নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন।
- মানুষের ধর্মীয় জীবনও যে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের শবযাত্রা ও সৎকারের বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা– প্রতিবেশির দল, চাকর-বাকর– সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোনো শোকের ব্যাপার –এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নতুন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষে দুফোটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণে গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা, –সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড়– নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপুত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো– আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী পরিজন–সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ– দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,– এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে– মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল– দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ বাবা,– বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল কৈ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরছে, তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে!– চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!

হাঃ– ধোঁ লেগেছে বৈ ত না! তুই কাঁদতেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,– শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– মৃত ব্যক্তির সৎকার; মৃত্যের জন্য অন্তিম বা শেষ অনুষ্ঠান। ***মুখুয্যে–*** মুখোপাধ্যায়; পদবির সংক্ষিপ্ত রূপ। ***বর্ষীয়সী–*** অতি বৃদ্ধ; স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। ***সঙ্গতিপন্ন–*** অর্থ-সম্পদের অধিকারী। ***সগ্য–*** স্বর্গ শব্দের কথ্যরূপ। ***অন্তরীক্ষ–*** আকাশ; গগন। **আচ্ছাদিত–** আবৃত; ঢাকা। **কলরব–** বহুকণ্ঠের সম্মিলিত গুঞ্জন; কোলাহল। **শ্মশান–** যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। **মূঢ়তা–** বোকামি; আহম্মকি।

সারসংক্ষেপ :

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ধনী মানুষ। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, জামাই-প্রতিবেশি, চাকর-বাকর মিলে বিরাট সংসার। তার স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। সবাই দুঃখ পেয়েছে সত্য, কিন্তু শবযাত্রা আর সৎকারের এত বড় আয়োজন হল যে ব্যাপারটা উৎসবের মতোই হয়ে উঠল। ছোটজাতের মেয়ে কাঙালীর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্মশানে মড়া পোড়ানোর দৃশ্য দেখছিল। স্বামী-পুত্র-পরিজনের এই আয়োজন– তার কাছে মুখুয্যেবাড়ির বউয়ের এই মৃত্যু বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার মনে হল। কাঙালীর মার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু ছেলে আছে। মৃত্যুর পর তাকেও যেন এভাবে পোড়ানো হয়, সে যেন ছেলের হাতের আগুন পায়– এই গভীর আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. মানিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. অনিমেষ চন্দ্র পাল ঘ. তাপসচন্দ্র পাল

২. অভাগী ছেলের হাতের আগুনকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
ক. শিব খ. স্বর্গ
গ. হরি ঘ. রথ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোলকাতায় বসবাস। মায়ের অসুস্থ হবার সংবাদ পেয়ে কোলকাতা থেকে যাত্রা করে গভীর রাতে বাড়ির নিকটে এসে নদীর তীরে পৌঁছেন। নদীতে পারাপারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে পানিতে সাঁতার দিতে হয়।

৩. উদ্দীপকের চরিত্রটি আপনার পাঠ্য গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ক. কাঙালী খ. জমিদার
গ. রসিক দুলে ঘ. গোমস্তা

৪. গল্পের যে বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে–
i. মায়ের প্রতি ভালোবাসা ii. মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ iii. মায়ের ঋণ পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অভাগী ও তার ছেলে কাঙালীর গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বৈ কি! কৈ, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়েসের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গীসাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে।

একহাতে গলা জড়াইয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই–

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুন রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার

আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসীকে বলতেছিল, ক্যাঙ্‌লার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুত সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক গে, –আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে।

রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া–

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র– সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়– নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই– কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনি। সেই রথ, সেই রাঙ্গা পা-টি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সে ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কে মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ– বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেই পাইল না, তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না– দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন,– রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,– কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী

গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস–কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা ! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হইত এতেই হবো, বাগদী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হলো না বাবা আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভালো হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না– ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারায় জল পড়িতে লাগিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ইন্দ্রজাল– জাদুবিদ্যা; এখানে গল্পের মাধ্যমে মুগ্ধ বা মোহিত করে রাখার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। **উপকথা–** কল্পিত গল্প; উপাখ্যান। **উৎপাত–** উপদ্রব। **কোটালপুত্তুর–** নগর-রক্ষকের ছেলে, কোতোয়ালের পুত্র। ক্রোড়– কোল। ***তেনার–*** তার; তাঁর। ***দুলে–*** পালকি বহনকারী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; নিচু জাতের মানুষ বলে অভিহিত। **নিকে–** বিবাহ। **পুলকে–** আনন্দে। ***প্রণামী–*** পুরোহিত বা দেব-দেবীকে দেওয়া সালামি; এখানে কবিরাজকে দেওয়া চিকিৎসা ফি হিসেবে দেওয়া টাকা বোঝানো হয়েছে **প্রলুব্ধ–** অতিশয় লোভাতুর; এখানে লোভ দেখানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ***প্রসন্ন–*** সন্তুষ্ট; খুশি। ***প্রসন্নমুখ–*** খুশি ভরা মুখ। **বিস্ময়ে–** অবাক হয়ে। ***ভগ্নকণ্ঠ–*** ভাঙা স্বর। ***ভুক্তাবশেষ–*** ভোজন বা খাওয়ার পরে পাতে যা পড়ে থাকে। **রাজপুত্তুর–** রাজার ছেলে। **রূপকথা–** অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি। ***রোমাঞ্চ–*** শিহরণ; অনুভূতির তীব্রতায় গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া। ***শশব্যস্ত–*** খরগোশ বা শশকের মতো ব্যস্ত। এখানে অতি আবেগে কাঙালীর ভাঙা বা বিকৃত স্বরে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। **সমাধা–** সমাধান শব্দের কথ্যরূপ।

সারসংক্ষেপ :

শ্মশান থেকে ফিরেই জ্বরে পড়ে অভাগী। বড়ই অভাবের সংসার তার। নিজে না খেয়ে ছেলের ভাত জুগিয়েছে। আজ শ্মশানের একটা দৃশ্য তার মনে গেঁথে গেছে। মুখুয্যে-বউয়ের চিতা থেকে যে ধোঁয়া উঠছিল আকাশের দিকে, সে যেন পরিষ্কার দেখতে পেল তাতে রথে চড়ে বউ যাত্রা করেছে স্বর্গের দিকে। সে কথাই সে কাঙালীকে বলে। বলে, সে যেন ছেলের হাতের আগুন পায়। স্বামীর পায়ের ধুলো পায়। তাহলে সেও স্বর্গে যেতে পারবে। ছোটলোক বলে আর কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। অভাগীর জ্বর বাড়ছিল। জ্বরের ঘোরে সে তার ছেলেকে এসব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. কাঙালীকে আর কত বৎসর অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?

ক. এক বৎসর　　খ. দুই বৎসর

গ. তিন বৎসর　　ঘ. চার বৎসর

৬. রূপকথা শোনার সময় কাঙালী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে যে কারণে–

i. ভয় ii. বিস্ময় iii. আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i, ii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।

৭. উদ্দীপকের বাপ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. অভাগী খ. রামসুন্দর

গ. ঈশ্বর নাপিত ঘ. রসিক দুলে

৮. উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

ক. বাৎসল্য খ. মর্ত্যপ্রীতি

গ. ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ঘ. খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জমিদারি ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকারহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্মীয় বিধি-বিধানের শ্রেণিগত-বর্ণগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে– ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে–

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ-সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে– পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলোর প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসী দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালে কেন ! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা– ক্যাঙালার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটা কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,– কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়াল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়াল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ, দারোয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দারোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দারোয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মার তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দারোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ বাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানিটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারিবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দারোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা, খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল, –আমার মা মরেচে –বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসী একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়– পাজী, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়,– হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন– মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। –এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার, –কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না– এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্চার্যমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত, –শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অগোচরে– অপ্রকাশ্যে; অজ্ঞাতে। ***অশন–*** খাদ্যদ্রব্য; আহারের বস্তু। **উত্তরীয়–** চাদর। **উদ্যত–** উদ্যোগী; উন্মুখ। **তথাপি–** তা সত্ত্বেও; তবুও। ***নিস্তব্ধ–*** নিশ্চল; নিঃসাড়; নির্বাক। **প্রতিবিধান–** প্রতিকার। **ফর্দ–** তালিকা। **বিলুপ্ত–** বিলীন। ***সংস্কার–*** বিশ্বাস; ঝোঁক; আজন্ম ধারণা। ***সন্ধ্যাহ্নিক–*** সন্ধ্যাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যকরণীয় পূজা। ***হরিধ্বনি–*** হরি নামের ধ্বনি; হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহ বহন করার সময় সমবেত কণ্ঠে দেবতা হরির নাম উচ্চস্বরে বলে থাকে, একে হরিধ্বনি বলে।

সারসংক্ষেপ :

সেই জ্বরেই অভাগীর মৃত্যু হল। মরার আগে কাঙালী তার বাবাকে নিয়ে এল। অভাগী অচেতন অবস্থায় পায়ের ধুলা নিল। কিন্তু তার বহু আকাঙ্ক্ষার দাহের আয়োজন করা অত সহজ ছিল না। তাদের ঘরের পাশেই একটা বেলগাছ। গাছ কাটার আয়োজন করতেই জমিদারের লোক এসে কুড়াল কেড়ে নিল। কাঙালী ছুটল জমিদারের কাছারিতে। পেল গলাধাক্কা আর গালিগালাজ। কাঠ চাইতে ঠাকুরদাস মুখুয্যের কাছেও সে গিয়েছিল। মায়ের শেষ আকুতি পূরণের জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু নিম্নবর্ণের এই মহিলার চিতায় চড়ার শখই সবার কাছে রসিকতার বিষয় বলে গণ্য হল। শেষ পর্যন্ত অভাগীকে মাটিচাপা দেওয়া হল নদীর চরে। এর আগে প্রতিবেশী রাখালের মার উদ্যোগে কাঙালী খড়ের আঁটি জ্বেলে মায়ের মুখে ছোঁয়ালো। ফেলে দেওয়া খড়ের আঁটি থেকে ধোঁয়া উঠছিল। কাঙালী অপলকে সেদিকে চেয়ে রইল। হয়ত তার মায়ের স্বর্গারোহণের রথ দেখা যায় কিনা, তাই দেখছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. অভাগীকে মৃত্যুর পর কোথায় শোয়ানো হয়েছিল?

ক. নদীর চরে　　খ. পাহাড়ের গর্তে

গ. বেলা ভূমিতে　　ঘ. বালুর মাঠে

১০. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ফুটে উঠেছে–

ক. সংসার প্রীতি　　খ. সামন্তবাদের নির্মম রূপ

গ. ধানের কারবারের বিবরণ　　ঘ. ঈশ্বর নাপিতের কথা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অর্থের অভাবে হরিপদের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হলো না তার ছেলের পক্ষে। তাই পলকহীন চোখ মেলে সে উপরের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

১১. উদ্দীপকের ছেলেটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. রামসুন্দর　　খ. অধর চন্দ্র

গ. রসিক দুলে　　ঘ. কাঙালী

১২. এই সাদৃশ্যটি যে বিষয়ে–

i. সমাজের নির্মমতায়　　ii. সমাজের অনগ্রসরতায়　　iii. সমাজের অলসতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩ চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১৩. জমিদারের গোমস্তার নাম কী?

ক. অধর রায় খ. অধর পাড়ে

গ. অধর মুখোপাধ্যায় ঘ. অধর ভট্টাচার্য

১৪. 'বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল।' –এখানে অন্য বাঘিনী কে?

ক. রসিকের দ্বিতীয় স্ত্রী খ. কাঙালীর মা

গ. কুলীন রায়ের প্রথম স্ত্রী ঘ. ঠাকুর দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী

১৫. 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানটি কোন ধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ?

ক. ইসলাম ধর্ম খ. বৌদ্ধ ধর্ম

গ. জৈন ধর্ম ঘ. হিন্দু ধর্ম

১৬.'সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়।' বাক্যটিতে প্রকাশিত হয়েছে–

i. বিরক্তি ii. হিংসা iii. বিদ্রূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জয়িতা এখনো স্কুলে যায়। ভীষণ আত্মপ্রত্যয়ী মেয়ে সে, হার না মানা স্বভাব তার। তার বয়স যখন ছয় মাস তখন তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। বাবা নতুন বিয়ে করে সংসার করছেন। তাই জয়িতা মায়ের কাছে বড় হয়েছে। তার বয়স এখন আঠারো। নিত্যদিন তাকে ক্ষুধা আর দৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এভাবে তার দিন কাটে আর মাস যায়। জয়িতা শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, মায়ের কষ্ট দূর করতে চায়।

ক. অভাগীর স্বামীর নাম কী?

খ. 'কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট।'– বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

গ. জয়িতা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? – আলোচনা করুন।

ঘ. "জয়িতার মায়ের স্বপ্নে অভাগীর স্বপ্নের অনুরণন রয়েছে।"– উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

দীর্ঘ দিন রোগভোগের পর সঞ্জয় দত্ত প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন যে, তার মৃতদেহ যেন যথাযথভাবে দাহ করা হয়। ছেলে বাবার মৃতদেহ দাহ করার জন্য গোয়ালের গরুটি বাজারে বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিল। পথে জমিদারের গোমস্তা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য পথ আটকে দাঁড়ায়। টাকাগুলো নিয়ে গোমস্তা চলে যায়। অপলকনেত্রে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সঞ্জয় দত্তের ছেলে। সঞ্জয় দত্তকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশে মাটি খুঁড়ে সমাহিত করা হয়েছিল।

ক. কাঙালী কবিরাজকে কত টাকা প্রণামী দিয়েছিল?

খ. 'অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল।' –উক্তিটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর স্বপ্নের মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানের অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ একই সূত্রে গাঁথা।" –উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

কার্তিক চন্দ্র রায় একসময় জমিদার ছিলেন। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ তার কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না। একদিন তিনি কাছারি বাড়িতে বসে আছেন। সে সময় একটি অসহায় দরিদ্র বালক এসে বলল, "আমার মা মরেছে। মায়ের সৎকারের জন্য কিছু

টাকা দেবেন জমিদার বাবু।" জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, "মা মরেছে তো কী হয়েছে, যা, দূরে সরে দাঁড়া। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস? এখানে একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে। কী জাতের ছেলেরে তুই?"

ক. কাঙালী কোন জাতের ছেলে?

খ. অভাগী মৃত্যুকালে কেন স্বামীকে ডেকে পাঠিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের জমিদারের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে একই সামাজিক সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. অভাগীর স্বামীর নাম রসিক বাঘ।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে কাঙালীর মায়ের ছোট ও অতি সাধারণ জীবনকালকে বোঝানো হয়েছে।

কাঙালীর মায়ের প্রায় ত্রিশ বছরের ছোট্ট জীবনটুকু বেদনায় ভরা। তাকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা গিয়েছিল। বাপ রাগ করে নাম দিয়েছেন অভাগী। সে অভাগী একদিন মা হল। কিন্তু একসময় স্বামীও তাকে ছেড়ে চলে যায়। কাঙালীকে নিয়ে অভাব-অনটনে ক্ষুদ্র জীবনকাল কাটিয়ে অভাগী একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ ছিল কাঙালীর মায়ের ছোট জীবনের করুণ ইতিহাস।

গ. জয়িতা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

মানুষ স্বপ্নবিলাসী। সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে। উদ্দীপকে জয়িতা এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী তাদের মায়ের কষ্ট দূর করতে চায়। আত্মপ্রত্যয়ী ও পড়াশোনায় মনোযোগী জয়িতা এবং কাজে নেমে পড়া অধ্যবসায়ী কাঙালী হয়ত একদিন সফল হবে তাদের মায়ের স্বপ্ন পূরণে।

উদ্দীপকে জয়িতা পিতৃহারা, মায়ের চোখের মণি। মা তাকে অনেক কষ্টে বড় করে তুলেছেন, জয়িতার স্বপ্ন সে মায়ের কষ্ট দূর করবে। তেমনি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীও পিতৃহারা ছেলে, শতকষ্ট আর অভাবের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মা তাকে বড় করে তুলেছে। পনের বছর বয়সেই সে বেতের কাজ শিখতে আরম্ভ করেছে। মায়ের স্বপ্ন আর বছর খানেকের মধ্যেই কাঙালী তার দুঃষ্ট-কষ্ট দূর করবে। কাঙালীর মা অভাগী ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রীর মতো তার মুখাগ্নি পেয়ে রথে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করবে।

ঘ. উদ্দীপকে জয়িতার মা এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর মা সন্তানের ক্ষেত্রে একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে।

পিতা-মাতা সন্তানের মধ্য দিয়ে তাদের অপূর্ণতা পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখে। উদ্দীপকে জয়িতার মা ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর মা তেমনই স্বপ্ন দেখে। তারা মনে করে সন্তান বড় হলে তাদের দুঃখ ঘুচবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা নিজ সন্তানদের মানুষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে জয়িতার মা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে সন্তানবাৎসল্যে নিজের কন্যা সন্তানকে অনেক কষ্টের ভেতরও পড়াশুনা করাচ্ছে। তার স্বপ্ন কন্যা তার দারিদ্র্য ও কষ্ট সবই দূর করবে। তদ্রূপ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর মা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে নিজের ছেলে কাঙালীকে অনেক কষ্টের ভেতরও পরম মমতায় বড় করে তুলেছে। পনের বছরের কাঙালী বেতের কাজ শিখছে। হয়ত সে তার মায়ের কষ্ট অচিরেই লাঘব করতে পারবে।

সন্তান মানুষ করতে গেলে মা-বাবাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কোনো কারণে সংসার ভেঙে গেলে তার প্রভাব সরাসরি সন্তানের ওপর পড়ে। উদ্দীপকে জয়িতা ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী সে পরিস্থিতির শিকার। সন্তান প্রতিপালনের সময় কেউ না কেউ একটু বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। উভয়ের ক্ষেত্রে মা বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। জয়িতা ও কাঙালীর মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে হয়তো সুখে থাকতে পারতো, কিন্ত জয়িতা ও কাঙালী বড় হত বিরূপ পরিবেশে। কষ্টসহিষ্ণুতা ও সন্তানবাৎসল্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত জয়িতা ও কাঙালীর মা একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক. কাঙালী কবিরাজকে এক টাকা প্রণামী দিয়েছিল।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে অভাগীর জীবন অবসানের পূর্ব মুহূর্তকে বোঝানো হয়েছে।

জীবনাবসানের পূর্বে অভাগী পুত্রকে তার মনের ইচ্ছাটুকু ব্যক্ত করে। পুত্র যেন শেষ মুহূর্তে তার পিতাকে ডেকে আনে, নিজ হাতে মায়ের মুখে যেন আগুন দেয়, মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেয়। এসব ছিল অভাগীর জীবন নাট্যের শেষ আরজি। অতি অল্পকাল অভাব অনটনে দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করে অভাগীর জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি হয়।

গ. উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর স্বপ্নের মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানে অমিল রয়েছে।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ মারা যাওয়ার পরে শাস্ত্রসম্মতভাবে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে। আমাদের সমাজে নিচু স্তরের মানুষের দৈন্যদশা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকতা হলেও তা ছিল নামে মাত্র।

উদ্দীপকে সঞ্জয় দত্তের ছেলে বাবার শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ করার জন্য পালের গরু বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফেরার সময় জমিদারের গোমস্তা খাজনা আদায়স্বরূপ টাকাটা জোর করে রেখে দেয়। ফলে আগ্রহ থাকলেও সঞ্জয় দত্তের ছেলের পক্ষে বাবার শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করা সম্ভব হয়নি। দুঃখিনী অভাগীও নিজের মৃত্যুর সময়ের সৎকার অনুষ্ঠানের স্বপ্ন দেখে। সে চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ধূপ, ধুনা ও অগ্নির ধোঁয়া সম্বলিত রথে করে মুখুয্যে বাড়ির গিন্নির মতো স্বর্গে যেতে চায়। সে আরও স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিচ্ছে, আর মৃত্যুর পরে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। দেখা যায়, উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

ঘ. সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার অন্তিম ইচ্ছাগুলো পুরণ করতে হয়। আমাদের সমাজের নিচু স্তরের মানুষের দৈন্যদশা এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত এং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগী তাই সমাজের বৈষম্যনীতি ও কুসংস্কারের কাছে হেরে যায়।

উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত গরিব। বিনা চিকিৎসায় তার মরণ আসে। তার শেষ ইচ্ছা হচ্ছে মরার পর যেন তাকে দাহ করা হয়। তেমনি অভাগী গরিব এবং স্বামী পরিত্যক্ত। মরণের আগে সে স্বামীর পায়ের ধুলো পেলেও মুখুয্যে-পত্নীর মতো আগুন পায় নি। উভয়ক্ষেত্রে তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের সামাজিক মর্যাদার কারণে।

উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটোতেই মৃতদের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ে জাতপ্রথা ও আর্থিক বৈষম্যের কারণে। তাই বলা যায়, সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উৎপল তার বাবাকে কখনো দেখেনি। জন্মের আগেই তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছেন। সে বড় হয়েছে মার কাছে। বড় হয়েছে অভাব, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যকে নিত্য সঙ্গী করে। বড় হয়ে সে নাট্যকার হতে চায়। শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। জীবন সংগ্রামে হার না মানা একজন নওজোয়ান উৎপল।

ক. 'দুলে' শব্দের অর্থ কী ?

খ. 'কি জাতের ছেলে তুই?।' –অধর রায় কেন এ কথা বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের উৎপলের সঙ্গে কাঙালীর বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকের উৎপল 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর চেয়ে জীবন-ভাবনায় অগ্রসর।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. ক ৯. ক ১০. খ ১১. ঘ ১২. ক
১৩. ক ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. ঘ

নিরীহ বাঙালি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক-পরিচিতি

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও মাতা রাহাতন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী। সেকালে নানা কুসংস্কারের কারণে বেগম রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয়নি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চাই নারী মুক্তির জন্য নিবেদিত। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত না হলে তাদের মনের প্রসার কিছুতেই সম্ভব হবে না এবং মুসলমান সমাজও কিছুতেই গড়ে উঠবে না– একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য নিজেই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজ-মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতার সুর সহজেই চোখে পড়ে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও মুসলমান বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাতয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সুলতানার স্বপ্ন, *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর*।

ভূমিকা

'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটিতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি নারী পুরুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক হাস্যরসাত্মকভাবে বর্ণনা করেছেন। এ রচনায় বাঙালির কর্মে খ্যাতি অর্জনের চেয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যে পাওয়া খ্যাতিতে আগ্রহের কথা কটাক্ষ করে তুলে ধরেছেন। বাঙালি পুরুষের কর্মবিমুখতা এবং বাঙালি নারীর দুর্বলচিত্ত ও অহেতুক রূপচর্চা সম্পর্কে এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও আচরণের কিছু দিক বর্ণনা করতে পারবেন।
- যে বৈশিষ্ট্যগুলো বাঙালির পরিহার করা উচিত, সেগুলোর বিবরণ লিখতে পারবেন।
- হাস্যরসাত্মক রচনার বিশেষ ভঙ্গি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যুথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা– এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙালি গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা– যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজি ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙালি তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙালি তাহাতে পদ্মিনী। যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙালি পুরুষিকা! অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলো,– পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল– অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলো– ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা– অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল– রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক– সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেশে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধূতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চালনের (Ventilation এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না ! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী– হেমাঙ্গী, কেষ্ণাঙ্গীগণ তদানুকরণে ইংরাজ ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম 'হাওয়ার শাড়ি' পরেন। বাঙালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুটি চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্ধবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্যি ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য– নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা রূপা জওযাহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিষটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়– পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাসের মূল্য কত জান? "অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এমএ পাস অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য– এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর,

কোমলাঙ্গ বাঙালি কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C পাশ করা সহজ। আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তাতে আমাদের কী?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা :

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজ্য" উপাধি লাভ সহজ।
(২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc ও D.Sc পাস করা সহজ।
(৩) অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।
(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বেদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।
(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।
(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।
(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose and Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।
(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য– আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নিত উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ– তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসি দাও !

আমরা সকলেই কবি– আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটিজুতা"– কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নতুন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা– "অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ– প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে ! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অমিয়াসিক্ত– অমৃত বা সুধা দ্বারা ভেজা। ***আত্মপ্রশংসা–*** নিজের প্রশংসা। **অন্নোৎপাদন–** খাদ্য উৎপাদন। **কর্ষণ–** চাষ। ***কালিডোর, মিল্ক অব রোজ, ভিনোলিয়া পাউডার–*** সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী। **কোমলাঙ্গ–** নরম শরীর। ***কুন্তলীন–*** লেখকের আমলে চুলে দেয়ার জনপ্রিয় তেলের নাম। **কৃষ্ণাঙ্গী–** কালো বর্ণের দেহ। **চন্দ্রিকা–** জ্যোৎস্না। **জওয়াহেরাৎ–** মণিরত্নাদি; বহুমূল্যবান প্রস্তরসমূহ। **জীর্ণ–** শীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত। ***ঝঞ্ঝাবাতে–*** ঝঞ্ঝার বাতাসে। **তরলমতি–** অস্থির; চঞ্চল। ***তণ্ডুল–*** চাল। **তুষানল–** জ্বলন্ত তুষের আগুন যা ধিক ধিক করে বহুক্ষণ ধরে জ্বলে। **ত্রিবিধ–** তিন প্রকার। ***দিব্যাঙ্গনা–*** স্বর্গের রূপসি;

হুরপরি। **নবনী–** ননী; মাখন। **নৈরাশ্য–** আশাহীনতা; হতাশা। **পরিত্যাজ্য–** বর্জনীয়; বর্জন বা ত্যাগ করা যায় এমন। **পদ্মিনী–** কমলিনী; পদ্মযুক্তা। **পারদর্শিতা–** বিচক্ষণতা; দক্ষতা । **ভগ্ন শূর্প–** ভাঙা কুলা। **মসী-*হাওয়ার শাড়ি–*** সূক্ষ্ম সুতোর শাড়ি। **মূর্তিমান–** সাকার; মূর্তি বা শরীর ধারণ করেছে এমন। **যূথিকা–** যুঁই ফুল। ***শুভ্রনীলাম্বর–*** পরিষ্কার নীল আকাশ। **শ্রমকাতর–** পরিশ্রম বা মেহনত করতে কষ্ট বোধ করে এমন। **সলিল–** পানি; বারি। **সমুদয়–** সব; সকল। ***সাশ্রুসজলনয়ন–*** জলভরা চোখ। **সুপ্তি–** তন্দ্রা; ঘুম। **হেমাঙ্গী–** সুন্দরী নারী। ***সৌকুমার্য–*** সৌন্দর্য।

সারসংক্ষেপ :

বাঙালি অপ্রয়োজনীয় রকমের নিরীহ আর কোমল। উপন্যাসের নায়িকা যেমন, সাহিত্যে কাব্য যেমন, বাঙালিও অনেকটা সেরকম। বাঙালির খাবার, পোশাক আর অবয়বেও লেখক প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার অভাব লক্ষ করেছেন। বাণিজ্য বাঙালি করে বটে, কিন্তু তাতে উদ্যমের বড়ই অভাব। কৃষিকাজের পরিশ্রম নয়, সে চায় মস্তিষ্কচর্চার আরাম আর আলস্য। নকল করায় সে ওস্তাদ, ফাঁকিতে সিদ্ধহস্ত; সার্টিফিকেট বিক্রি করে শ্বশুরের অর্থ লুণ্ঠনে তার ব্যাপক আগ্রহ। আলস্যে বাঙালি নারীও কম যায় না। বাংলা অঞ্চলে বীররস দুর্লভ। এখানে করুণরসেরই প্রাধান্য। হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে লেখক বাঙালি জীবনের বহুদিকের সমালোচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আত্মসমালোচনা করে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘পাস বিক্রয়’ ব্যবসায়ের বিক্রেতা কে?

ক. বর　　খ. বরের পিতা

গ. কনে　　ঘ. কনের পিতা

২. “কুন্তলীনের সঙ্গে ‘কেশলীন’ বিক্রয় হয়।” উক্তিটির মানে হচ্ছে–

ক. মান নিয়ন্ত্রণের অভাব　　খ. তুচ্ছ জিনিসের ছড়াছড়ি

গ. উৎপাদনের আধিক্য　　ঘ. অবাধ নকল প্রবণতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শিল্পপতি কবির সাহেব বিপদে না পড়লে গরীব মানুষকে সাহায্য করেন না। সুনজরের প্রত্যাশায় এবার তাকে দেখা গেল স্থানীয় সংসদ সদস্যের জন্মদিনে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে।

৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে আপনার পাঠ্য কোন প্রবন্ধের মিল রয়েছে?

ক. নিরীহ বাঙালি　　খ. বাঙলা শব্দ

গ. পয়লা বৈশাখ　　ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৪. উদ্দীপক ও ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধ আমাদের চরিত্রের কোন দিকটি তুলে ধরে?

i. অল্প আয়াসে লাভের প্রত্যাশী

ii. কোমলতা ও মহানুভবতা

iii. সহজলভ্য জীবিকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘নিরীহ বাঙালি’ কী জাতীয় রচনা ?

ক. নারী উন্নতি বিষয়ক　　খ. পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক

গ. হাস্য রসাত্মক　　ঘ. জাতীয় দুর্যোগ বিষয়ক

৬. 'আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না।' –উক্তিটিতে বেগম রোকেয়া বাঙালি জাতির কোন বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন?

ক. আলস্যপ্রিয়তা খ. সংস্কৃতিপ্রিয়তা

গ. খাদ্যব্যবহারে বৈচিত্র্য ঘ. ঐতিহ্যপ্রিয়তা

৭. 'হাল চাষের চেয়ে গরুর দুধ পান করা সহজ।' –বাক্যটিতে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধ অনুযায়ী বাঙালির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় তাহলো–

i. নমনীয়তা

ii. আরামপ্রিয়তা

iii. কর্মবিমুখতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঝিলাম উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে চাষাবাদ করত। সম্প্রতি সে চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে রাঢ়িখাল বাজারে প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান করেছে। তার ধারণা, এতে তার সম্মান বেড়েছে এবং পরিশ্রম কমেছে।

৮. উদ্দীপক ও 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে –

ক. শ্রমভীরুতা খ. বিলাসিতা

গ. বাতুলতা ঘ. নমনীয়তা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নন্দ বাড়ির হতো না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুকুর আর গাড়ি চাপা পড়ার ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল–
সকলে বলিল, 'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।'

ক. 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখিকা কোনটিকে ত্রিগুণাত্মক বলেছেন?

খ. 'আমাদের অন্যতম ব্যবসায় পাস বিক্রয়।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের নন্দলাল 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের নন্দলালের ভীরুতা 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখক সরস, সুস্বাদু ও মধুরকে ত্রিগুণাত্মক বলেছেন।

খ. বরের পাস করা ডিগ্রিকে 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধে লেখক রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন আমাদের অন্যতম ব্যবসায় বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঙালি বরেরা তাদের পাস করা ডিগ্রিকে শ্বশুরপক্ষের কাছে বিক্রি করে কন্যাপক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে যৌতুক গ্রহণ করে। তারা নিজেদের শিক্ষাকে বিক্রি করে কন্যা ও কন্যার পিতার সম্পত্তি উভয়ই দাবি করে। তাই লেখক উক্তিটি বরেছেন।

গ. নন্দলালের বৈশিষ্ট্য 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে অলস বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। তবে বাঙালির অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে তাদের শ্রমবিমুখতা। তারা অলস প্রকৃতির। কোনভাবে উদরপূর্তি করতে পারলেই গা এলিয়ে ঘুমায়, পরের বেলার খাবারের কথা ভাবে না। বাঙালির এ স্বভাব তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

উদ্দীপকে নন্দলালের ঘরে বসে থাকার কারণ ও জীবন যাপনের ধরন তুলে ধরা হয়েছে। এতে নন্দলালের শ্রমবিমুখতা এবং তার আলস্যভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির বাইরে গেলে কোথায় কোন সমস্যায় পড়ে এই ভয়ে সে সব কাজ ফেলে শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পছন্দ করে। তার এই মূল্যহীন যুক্তি ও অলসতা 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের বাঙালির কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের সমাজে নন্দলালের মতো অনেক লোক রয়েছে যারা দেশসেবার নামে আলস্য ও প্রাণ বাঁচানোকে একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। কীসে মর্যাদা বাড়ে, আর কীসে কমে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে বাঙালিদের অবস্থাও তাই। তারা অমর্যাদাকর জীবনযাপন করতে আগ্রহী। কর্ম করে জীবনের উন্নতি করতে নারাজ। বলা যায়, উদ্দীপকের নন্দলালের বৈশিষ্ট্য 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করে।

ঘ. বাঙালি জাতি পরিশ্রম করা অপেক্ষা তোষামোদ করাকে বেশি পছন্দ করে, করুণার পাত্র হয়ে বাঁচতে দ্বিধাবোধ করে না যা উদ্দীপকের নন্দলালের ভীরুতার সমপর্যায়ে পড়ে।

উদ্দীপকে নন্দলালের কোনো একটা সমস্যা ও সংকটের ভয় এবং অলসতাকে তুলে ধরা হয়েছে। সাপ ও কুকুরের ভয়ে সে বাইরে যায় না। কলিশন ও গাড়ি চাপার ভয়ে কোথাও ভ্রমণ করে না। শুধু শুয়ে শুয়ে বহু কষ্টে সময় কাটায়। তার সবসময় ভয়। অন্যদিকে কর্মবিমুখতা বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখক এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেছেন। বাঙালি নারী-পুরুষ কীভাবে তাদের জীবন পরিচালনায় অলসতার পরিচয় দেয় তা উপস্থাপন করেছেন। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখক হাস্যরসের মাধ্যমে বাঙালি পুরুষের কর্মবিমুখতা এবং বাঙালি নারীর দুর্বলচিত্ততা এবং অহেতুক রূপচর্চা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। অমর্যাদাকর অলসতাকে বাঙালি কীভাবে গ্রহণ করে আর মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কীভাবে শ্রমবিমুখ হয় সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দীপকে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের এই দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ নন্দলাল বাঙালির অলসতা, কর্মবিমুখতা ও আত্মমর্যাদাহীন জীবন যাপনের প্রতীক।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণে তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

ক. 'অবরোধ বাসিনী' গ্রন্থটির লেখক কে?
খ. 'আমাদের স্বভাবে ভীরুতা অধিক।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের যে দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা আলোচনা করুন।
ঘ. "নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের মূল ভাবই যেন উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. ঘ ৮. ক

মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

লেখক-পরিচিতি

১৮৯৬ সালে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯১৮ সালে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। বিএ পড়াকালীন মওলানা আকরম খাঁর প্রভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ আর হয়নি। এরপর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক মোহাম্মদী', 'নবযুগ' 'দৈনিক সেবক', 'সাপ্তাহিক সওগাত', 'সাপ্তাহিক খাদেম', ইংরেজি 'দি মুসলমান' ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। বিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ওয়াজেদ আলী তাঁদের অন্যতম। চিৎপ্রকর্ষের সাধনায় অর্জিত প্রজ্ঞাবলে উন্নতমানের জীবনী, নকশা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছুর বিচার করতেন। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যশৈলী ঋজু, রচনা সাবলীল। ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর স্বগ্রামে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

মরুভাস্কর, মহামানুষ মুহসীন, সৈয়দ আহমদ, ছোটদের হযরত মুহম্মদ।

ভূমিকা

'মানুষ মুহাম্মদ' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরুভাস্কর' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। এ প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদের মানবীয় গুণাবলির কথা এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহৎ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধকার ইসলাম ধর্মে মানবাধিকারের ধরন এবং মহানবীর প্রতি বিধর্মীদের নিষ্ঠুরতা ও তাঁর ত্যাগের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধ পাঠ শেষে আপনি–

- মানুষ হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারবেন।
- হযরতের জীবন-সাধনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মুহম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সাফল্যের কারণগুলো লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

হযরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।

মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হযরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী : মুহম্মদ (স.) এজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন; তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হযরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলেরই চৈতন্য হইল। হযরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হযরতের বাণী : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি অমর সাক্ষ্য : মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হযরত আবুবকর (রা) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ– এই কথাই বৃদ্ধ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হযরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই।

জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল-আমিন– বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হযরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হিযরতের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হযরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হযরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নব অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্তশ্রী। তাঁহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন, কাজল রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল, তাঁহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের ঢলঢল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তাঁহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

সত্যই হযরত বড় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপে বারবার

তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

তায়েফে সত্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কী ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উপহাসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন : না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়তো কাল তাহারা-তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি ঊর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন : তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও। বিপদাবরণ তুমি অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা– তাঁহাদের পংক্তিতে আমার স্থান দাও।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকুতোভয়– নির্ভয়। ***অনুরুদ্ধ–*** অনুরোধ করা হয়েছে এমন। **অবিনশ্বর–** অক্ষয়; অবিনাশী। ***অরাতি–*** শত্রু। **অন্তরীক্ষে–** আকাশে, গগনে। ***ওমর–*** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন তেজস্বী বীরযোদ্ধা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোরেশ বংশোদ্ভূত তরুণ বীর ওমর মহানবীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভগ্নীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহানবীর বিশ্বাসভাজন সাহাবা। **কেশপাশ–** চুলের গোছা। **কান্তশ্রী–** সুন্দর; মনোরম। **কুটিরস্বামী–** গৃহের মালিক। ***কুসুমকোমল–*** ফুলের মতো নরম। ***গ্রীবা–*** ঘাড়। **চৈতন্য–** চেতনা। ***তিতিয়া–*** ভিজে। ***তায়েফ–*** সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ। ***ধী–*** বুদ্ধি। ***নির্যাতন–*** অত্যাচার; জুলুম। ***পরহিতব্রতী–*** পরের উপকারে নিয়োজিত। ***পুলকদীপ্তি–*** আনন্দের উদ্ভাস। ***পূর্ণোদর–*** ভরপেট। **প্রস্তরঘায়ে–** পাথরের আঘাতে। ***পৌত্তলিক–*** মূর্তিপূজক। **বয়ান–** বর্ণনা; বিবরণ। ***বীরবাহু–*** শক্তিধারী। ***লোষ্ট্রাঘাত–*** ঢিলের আঘাত। ***বৈরী–*** শত্রু। ***মহামতি আবুবকর–*** ইসলামের প্রথম খলিফা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম পুরুষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মহানবীর হিযরতকালীন সঙ্গী এবং সারাজীবনের বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ***মক্কা–*** সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান নগরী। এখানে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ বিদ্যমান। এই নগরীতে রাসুলুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ***মদিনা–*** সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত নগরী। এখানে হযরত মুহম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকরের (রা.) মাজার রয়েছে। **মহামতি–** উদার হৃদয়; অতি উন্নত চরিত্র। **মূর্ছিত–** অচেতন; জ্ঞানহারা। ***রাসুল–*** আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। ***রুধিরাক্ত–*** রক্তাক্ত, রক্তরঞ্জিত। ***রাহী–*** পথিক, মুসাফির। ***হিজরত–*** শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ। এখানে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা বোঝানো হয়েছে। ***স্থিতধী–*** স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। ***সমাচ্ছন্ন–*** অভিভূত।

সারসংক্ষেপ :

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর খবরে মদিনায় শোকের আঁধার নেমে এসেছিল। হযরত ওমর (রা.) সহ অনেকেই তাঁর মৃত্যু মেনে নিতে পারছিলেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি মানুষই বটে, তাই তাঁর মৃত্যুই স্বাভাবিক। আসলে কোনো অলৌকিক ক্ষমতাবলে হযরত সাফল্য পাননি। মানবিক গুণাবলিই তাঁকে বিজয়ী করেছিল। তাঁর অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য মানুষকে আকর্ষণ করত। ভালোবাসা দিয়েই তিনি মানুষকে জয় করেছিলেন। সত্যের বাণী প্রচারে অসীম ধৈর্য আর সাহসই তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মরুভাস্কর' গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. এস. ওয়াজেদ আলী খ. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. ফররুখ আহমদ

২. হজরত মুহম্মদ (স.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন কেন?
ক. শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খ. মক্কাবাসীর নির্যাতনে
গ. মদিনাবাসীর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে ঘ. ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আজগর সাহেব খুবই সৎ ও বিনয়ী একজন মানুষ। কর্মনিষ্ঠায় তিনি তাঁর অফিসে সকলের সেরা। তা সত্ত্বেও তার আদর্শের কারণে সহকর্মীরা তাঁকে বিদ্রুপ ও উত্ত্যক্ত করেন। তিনি নীরবে সব কিছু সহ্য করেন, কাউকে কিছু বলেন না।

৩. উদ্দীপকে প্রকাশিত গুণটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনার যে বাক্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে–
ক. আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র। খ. মুহম্মদ(স.) আল্লাহর দাস(মানুষ) ও রাসুল।
গ. এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর। ঘ. তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

৪. উদ্দীপকের আজগর সাহেব অপমান সহ্য করায় 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনা অনুযায়ী মুহম্মদ (স.)-এর কোন গুণের অধিকারী হয়েছেন?
i. মহানুভবতা ii. স্বাভাবিকতা iii. উদারতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দশের মধ্যে থেকেও তিনি কীভাবে সবার অনুকরণীয় হয়ে উঠলেন, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মক্কাবাসীরা হযরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কী নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল, কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হযরত মদিনায় চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হযরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, শত শত ঘাতক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র ঘাতক পাঠানো হইল। বদর, ওহোদ ও আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের যুদ্ধে হযরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হুদায়বিয়া সন্ধিতে হযরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হযরত যেই দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল

বৈরিতার বিষাক্ত বাণ; হযরত তাঁহাদের সহিত কী ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হযরতের বিরাট মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণায় নয়, মানুষ হিসেবে আপনার তুচ্ছতাবোধ আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমাগৌরবকে মুহূর্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কাবিজয়ের পর হযরত সাফা পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হযরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হযরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ত্রুটি হইতে পারে এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করিয়াছেন। একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ। সম্ভবত সে হযরতের দুই একটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হযরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হযরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হযরত বড় আদর করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

মানুষ হিসেবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হযরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছা-স্বীকৃতি দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড় অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হযরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকালের সঙ্গী সহচররূপে সহোদয় ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবী মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লান বদনে সহিলেন। হায়, সেই দয়ার নবী, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাট রুধিরাক্ত হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন। দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবী আজ চলিয়া গেলেন। বিবি আয়েশার মর্মছেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের, সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু ঊর্ধ্ব লোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সহজ, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন-চরিত্র সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির পৃথিবীতে বড় সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অতন্দ্র– নিদ্রাহীন; জাগ্রত। ***আয়েশা (রা.)–*** হযরত আবুবকরের কন্যা, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অন্যতম সহধর্মিণী। ***বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর–*** হযরতের জীবনকালে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এইসব স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল। ***হুদায়বিয়া–*** একটি যুদ্ধক্ষেত্র; এই স্থানে বিধর্মীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.)-র একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ***খালিদ–*** হযরতের জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা এবং সেনাপতি। ***সাফা–*** সাফা ও মারওয়া দুটি ছোট পাহাড় কাবার নিকটে অবস্থিত। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে আজও হজব্রতীরা সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে থাকেন। **সহনাতীত–** সহ্য করা যায় না এমন। **তুলাদণ্ড–** ওজন পরিমাপক যন্ত্র। **বৈরিতা–** শত্রুতা। **সত্যান্বেষী–** প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য যে অনুসন্ধান করে। **মহামহিমা–** অতিশয় মহান। **দীক্ষা–** ধর্মোপদেশ, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রদান। **স্মিতমুখে–** অল্প হাসি; ঈষৎ হাস্য। **সমুৎসুক–** অতিশয় আগ্রহ বা জানার ঔৎসুক্য প্রকাশ। **প্রয়াসী–** পরিশ্রমী; ইচ্ছুক। **মহাপ্রয়াণ–** মৃত্যু; শেষ যাত্রা।

সারসংক্ষেপ :

সত্য প্রচারের জন্য হযরত মুহম্মদ (স.) যে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার কথা তিনি কখনো ভাবেননি। ক্ষমাই ছিল তাঁর আদর্শ। নিজেকে তিনি কখনো উঁচুতে তুলতে চাননি। বরং দশের মধ্যে থেকেই সবার জন্য কাজ করেছেন। নিজের সুখের কথা ভাবেননি। জীবনপাত করেছেন মানুষের কল্যাণে। তাই মানবসমাজের একজন হয়েও তিনি মহামানব; তাই মানুষের অতি আপনজন হয়েও তিনি চির-অনুকরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. সাধারণ শুষ্ক মাংস নিত্য আহার করতেন কে?

ক. হযরত মুহম্মদ (স.) খ. হযরত আবু বকর (রা.) গ. বিবি আয়েশা (রা.) ঘ. হযরত ওমর (রা.)

৬. 'মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ,আমাদের অতি আপন জন হইয়াও তিনি বরণীয়।' বাক্যটিতে বোঝানো হয়েছে–

i. ত্যাগে মহিমান্বিত ii. ক্ষমায় মহান iii. গুণে অনুকরণীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পুণ্যে পাপে, সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে কী?

i. প্রেক্ষাপট ভিন্ন ii. মূলভাবকে ধারণ করে iii. আংশিক প্রতিচ্ছবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, iii

৮. উদ্দীপক ও 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মৌল প্রত্যাশা–

ক. মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা খ. সাম্য চেতনা গ. দেশপ্রেম ঘ. অধ্যবসায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'রাহী' শব্দের অর্থ কী ?

ক. মুসাফির খ. মুসাফির
গ. পথপ্রদর্শক ঘ.পথভ্রষ্ট

১০. পাপ করেছে এমন মানুষদের হজরত মুহাম্মদ (স.) কী করতেন?

ক. নির্যাতন করতেন খ. উপদেশ দিতেন

গ. ঘৃণা করতেন ঘ. রাগ করতেন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

... তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব সেই পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।

১১. উদ্দীপকটি যে রচনাকে ইঙ্গিত করে–

ক. নিমপাতা খ. মানুষ মুহম্মদ (স.)

গ. প্রাণ ঘ. নিয়তি

১২. উদ্দীপকটি মানবীয় গুণাবলির যে দিক প্রকাশ করে–

i. ক্ষমা ii. মহানুভবতা iii. উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন খুবই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। শৈশব হতেই তিনি লজ্জাশীলতা ও শালীনতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। একদিকে তিনি আমানতদারী, সত্যকথন ও অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন, অপরদিকে মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তা, সভ্যতাবর্জিত ও রুচিবিগর্হিত আচার-অভ্যাস হতে ছিলেন বহুদূরে। এভাবে মানুষের প্রতি প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত হযরতের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্ব।

ক. হজরত মুহম্মদ (স.) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

খ. হজরত আবু বকর (রা.) কী করে সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন?

গ. উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সামগ্রিক দিকটি নয়, আংশিক ভাব প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

মহাপুরুষ আরও ছিলেন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও অনেকে পোষণ করেছেন কিন্তু তাঁর মতো আর কেউ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে এত সজাগ ছিলেন না। অথবা সেই কর্তব্যকে এত বীরত্বের সঙ্গে কেউই সফল করতে পারেননি।

ক. বিনয় ও নম্রতা কার প্রকৃতি?

খ. 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাবটিই 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে অনুরণিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. হজরত মুহম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

খ. হজরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে হজরত আবু বকর (রা.)-এর গম্ভীর উক্তি সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিল।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যু-সংবাদে তাঁর অনুসারীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তখন হজরত আবু বকর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন, আর যাহারা আল্লাহর উপাসক তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর।' তিনি আরো বলেন: 'রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন। তাই বলিয়া তিনি যে সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া

গ্রহণ করিবে না?'-এ সংলাপগুলো শ্রবণ করে সকলের বিবেচনা শক্তি ফিরে আসে। এভাবে হজরত আবু বকর (রা.) সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে হজরত মুহম্মদ (স.) -এর চরিত্রে মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষর প্রাণের নবি। তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি মানুষকে বিস্মিত করত। সত্য ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাই মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ভেদ ও বৈষম্য তা তিনি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর অনেক গুণের একটি হল মানবপ্রেম। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠ বলে ভাবেননি। বরং অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি নিজেকে মানুষ ভেবেছেন। সততা, শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম তথা মনুষ্যত্বে তিনি এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। উদ্দীপকেও দেখা যায় মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় প্রেম ও পুণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্বের অনুকরণীয় নমুনা।

ঘ. উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে, পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রকাশিত হয়নি।

হজরত মুহম্মদ(স.) বিশ্ব মানবের মুক্তির পথিকৃৎ। মানব জীবনের পূর্ণ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষকে বিশ্বাস করতেন। শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে তিনি নিজের জীবনকে রূপায়িত করেছিলেন।

উদ্দীপকে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ সৈনিক। শৈশব হতেই তিনি শালীনতাসম্পন্ন জীবন যাপন করতেন। তাঁর নিকট সকল মানুষই সমান ছিল। মানুষের প্রতি প্রেম-প্রীতি উদ্ভাসিত হজরতের (স.) মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্ব। 'মানুষ মুহম্মদ(স.)' প্রবন্ধেও দেখি তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছেন। পৃথিবীর বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে তিনি ছিলেন সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্র মানুষের জন্য অনুকরণীয়। তিনি পৃথিবীতে মানবজাতির পথপ্রদর্শক। উদ্দীপকে দেখা যায় মুহম্মদ (স.)-এর জীবনীর একটি অংশই ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.) জীবনীর পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সামগ্রিক ভাব নয়, আংশিক পরিচয় ফুটে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মহানবি (স.) একটি সুস্থ এবং সম্ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক জীবন মুসলমানদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন। এ জীবনের লক্ষ্য ছিল বিশ্বাসীগণকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে, সুস্থতার মধ্যে, বিনয়ের মধ্যে এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতচিত্ততার মধ্যে তিনি মুসলমানদের নতুন জীবনে দীক্ষিত করেছিলেন। এ জীবনে আনন্দ এবং কৌতুক ছিল। একজন মুসলমান যদি রাসুল (স.)-এর সামগ্রিক জীবনযাপন লক্ষ করে তাহলে সে দেখবে যে তাঁর সে জীবন ছিল একটি পরিপূর্ণ জীবন, একই সঙ্গে সহজ মাধুর্যময় এবং মহার্ঘ্য।

ক. হুদাইবিয়া কী ?

খ. 'জন্ম দুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপক ও মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের মর্মার্থ নিহিত রয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. খ ১১. খ ১২. ঘ

নিমগাছ

বনফুল

লেখক-পরিচিতি

বনফুল ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়ার অন্তর্গত মণিহার গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেন এবং শিক্ষকের কাছ থেকে নিজের নাম লুকোতে বনফুল ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। তাঁর পিতা ডা. সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের আদিনিবাস হুগলি জেলায়। বনফুল ১৯১৮ সালে পূর্ণিয়ার সাহেবগঞ্জ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, ১৯২০ সালে হাজরীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আইএসসি এবং ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরির মাধ্যমে বনফুলের কর্মজীবন শুরু এবং প্যাথলজিস্ট হিসেবে ৪০ বছর কাজ করেন। ১৯১৫ সালে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় 'মালঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৮ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরে 'প্রবাসী', 'ভারতী' ও সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিভিন্ন পুরস্কারসহ তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর প্রধান রচনা :

গল্পগ্রন্থ : *বনফুলের গল্প, বাহুল্য, অদৃশ্যলোক, বিন্দুবিসর্গ, অনুগামিনী, তন্বী, ঊর্মিমালা, দূরবীন*।
উপন্যাস : *তৃণখণ্ড, কিছুক্ষণ, দ্বৈরথ, নির্মোক, সে ও আমি, জঙ্গম, অগ্নি*।
কবিতা : *বনফুলের কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, চতুর্দশপদী*;
জীবনী নাটক : *শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর*।

ভূমিকা

'নিমগাছ' গল্পটি বনফুলের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'অদৃশ্যলোক' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। এই গল্পে লেখক সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে যে গভীর বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ গল্পে লেখক নিমগাছের প্রতীকের মাধ্যমে একজন গৃহকর্ম-নিপুণা বধূর জীবনবাস্তবতা তুলে ধরেছেন। নিমগাছ যেমন মানুষের নানা উপকারে আসে অথচ কেউ এর যথার্থ মূল্যায়ন করে না, তেমনি প্রাত্যহিক জীবন-সংসারের জালে আবদ্ধ বধূরও যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।

উদ্দেশ্য

'নিমগাছ' গল্পটি পড়া শেষে আপনি–

- নিমগাছের বিচিত্র ব্যবহার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বাড়ির বউয়ের সঙ্গে নিমগাছের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রূপক-প্রতীকধর্মী সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!
কেউবা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই ...
কিম্বা ভেঙে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ... দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
বলে– 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।'
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।
আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ– সে আর-এক আবর্জনা।
হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল,– 'বাহ্, কী সুন্দর পাতাগুলি ... কী রূপ ! থোকা-থোকা ফুলেরই বা কী বাহার... একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ্–'
খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
কবিরাজ নয়, কবি।
নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক একই দশা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অব্যর্থ– যা বিফল হবে না। ***কবি–*** যিনি কবিতা লেখেন। ***কবিরাজ–*** যিনি গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন। **কিম্বা–** কিংবা। ***খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে–*** চুলকানির স্থানে লেপন করবে; **গজালে–** জন্মালে। ***গরম তেলে ভাজা–*** নিমপাতা গরম তেলে ভাজলে মচমচে হয় এবং তা খেতে খানিকটা উপাদেয় হয়। ***ছাল–*** বাকল; এখানে নিমগাছের বাকল। **পঞ্চমুখ–** পাঁচমুখ বিশিষ্ট; এখানে অতিরিক্ত প্রশংসা বোঝানো হয়েছে। ***পাতাগুলো খায়ও–*** নিমের কচিপাতা খেলে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। **মহৌষধ–** যে ওষুধ উৎকৃষ্ট বা অব্যর্থ। **বিজ্ঞ–** জ্ঞানী; পণ্ডিত। ***শান দিয়ে বাঁধানো–*** এখানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বোঝাচ্ছে। ***শিকড় অনেক দূর চলে গেছে–*** প্রতীকাশ্রয়ে বর্ণিত। নিমগাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং চারিদিকে বিস্তৃতও হয়। লক্ষ্মী বউটার প্রতীক যেহেতু নিমগাছ সেহেতু নিমগাছের শিকড়ের সঙ্গে বউয়ের সংসারের জালে চারিদিকে আবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ***শিলে পেষা–*** নিমগাছের পাতা শিলপাটায় বেটে তা থেকে রস বের করা হয়। **সহযোগ–** মিলন; সংযোগ। **সায়রে–** সাগরে।

সারসংক্ষেপ :

নিম মানুষের জন্য খুবই উপকারী। মানুষ বিচিত্রভাবে তার উপকার গ্রহণও করে। কিন্তু গাছটার দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয় না। তার অবস্থান এক কোণে – ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে। অনাদর-অবহেলায়ও তার কিছু করার থাকে না। গাছের তো আর নড়ার উপায় নেই। শেষের একটিমাত্র বাক্যে লেখক এই নিমগাছের তুলনা করেছেন বাড়ির বউটার সঙ্গে। বোঝা যায়, নিমগাছের ছলে তিনি আসলে বউয়ের গল্পই বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বনফুল কোন পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন?
ক. সোমবারের চিঠি খ. রবিবারের চিঠি
গ. শনিবারের চিঠি ঘ. সাধনা

২. নিমগাছ লোকটার সাথে যেতে পারল না কেন?
ক. শিকড় অনেক দূর বিস্তৃত খ. বাড়ির মালিকের অনুমতি নেই
গ. নিমগাছ বাড়িটাকে পাহারা দিবে ঘ. লোকটা কবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঘৃতকুমারীর নরম অংশ দিয়ে শরবত তৈরি করা হয়। এর শরবত যেমন উপকারি, তেমনি সুস্বাদুও।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত গাছের সঙ্গে আপনার পাঠ্য গল্পের কোন গাছের মিল রয়েছে?
ক. কলাগাছ খ. নিমগাছ
গ. কাঁঠাল গাছ ঘ. লিচু গাছ

৪. উদ্দীপকের ঘৃতকুমারীর ও গল্পের গাছের যে রূপটি প্রকাশিত হয়েছে–
i. ধ্বংসাত্মক রূপ ii. কল্যাণময় রূপ iii. সর্বগ্রাসী রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বনফুলের প্রকৃত নাম কী ?
ক. বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বলাইচাঁদ ভট্টাচার্য
গ. বলাইচাঁদ রায় ঘ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৬. কবিরাজ বলতে বোঝায় ?
ক. রাজাদের কবি খ. কবিদের রাজা
গ. গাছ-গাছালি নির্ভর মনুষ্যরোগের চিকিৎসক ঘ. হোমিওপ্যাথি নির্ভর মনুষ্যরোগের চিকিৎসক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হিন্দুবাড়িতে দিন শেষে গৃহিণীরা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, প্রণাম করে গলায় আঁচল দিয়ে। কেননা বিশ্বাস অনুযায়ী তুলসী গাছ পবিত্রতার প্রতীক।

৭. উদ্দীপকের তুলসী গাছের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের মিল রয়েছে–
i. শিকড়ে
ii. পবিত্রতায়
iii. গুণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপকের তুলসী গাছ থেকে নিমগাছটি কীভাবে ব্যতিক্রম ?

ক. অবহেলায়　　খ. শিকড়ে

গ. অযত্নে　　ঘ. আকারে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১. মোটে এগার বছর বয়স আতর বানুর। মা-বাবা নেই। ভাই-ভাবীর সংসারে পড়ে আছে। খুব যে ভালো আছে তা নয়। উঠতে বসতে টিপ্পনি আর তিরস্কার তার নিত্য উপহার। কাজল খালা একবার ভেবেছিলেন বোনঝিকে নিজের কাছে নিয়ে মানুষ করবেন। কিন্তু আতর বানু রাজি হয়নি। রক্তসম্পর্ক ছেড়ে সে অন্য কোথাও পরগাছা হতে চায় না। কাজল খালা আতর বানুর মানসিকতা উপলব্ধি করে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

ক. নিমগাছটার কার সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছা করল?

খ. কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন?

গ. উদ্দীপকের আতরবানুর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের কাজল খালার ভূমিকা 'নিমগাছ' গল্পের কবির মতোই।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১-এর নমুনা উত্তর :

ক. নিমগাছটার কবির সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছা করল।

খ. নিমগাছের নানারকম ভেষজ গুণ রয়েছে। তাই কবিরাজরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

নিমগাছ কার্যকর এক ভেষজ উদ্ভিদ। এর বিভিন্ন অংশ রোগ নিরাময়ের কাজে লাগে। নিম গাছের ছাল সিদ্ধ করে বা পিষে চর্মরোগের ওষুধ তৈরি করা হয়। নিমের কচিপাতা খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, যকৃতের উপকার হয়। নিমের কচি ডাল চিবানোয় দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এতসব উপকারী গুণের কারণেই কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন।

গ. উদ্দীপকের আতর বানুর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার সাদৃশ্য রয়েছে।

সমাজে সবসময় দুই শ্রেণির লোক দেখা যায়। এক শ্রেণির লোক কেবল উপকার ভোগ করে। আর এক শ্রেণির লোক আছে যারা কেবল সমাজ ও সংসারের জন্য প্রাণপাত করে। তারা নিজের চারপাশের পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলেন। এ ধরণের লোক নিজেদের শিকড়কে ছাড়তে চান না। 'নিমগাছ' গল্পে আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই।

আতর বানু পিতামাতা হারানোর পর ভাইয়ের সংসারে অনেকটা অবাঞ্ছিতের মত বড় হতে থাকে। উঠতে বসতে তাকে তিরস্কার আর টিপ্পনি সহ্য করতে হয়। আতর বানু মনে করে ভাই-ভাবির সংসারের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক। সেজন্য আতর বানু অবহেলা আর অযত্নের পরও সংসারের বাঁধন ছিন্ন করে চলে যেতে পারে না। এমনকি কাজল খালার অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। তেমনি নিমগাছ গল্পের লক্ষ্মী বউটি সংসারে সবার সেবায় নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারের কেউই তার যত্ন বা সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবে না। তবু সংসারের প্রতি মায়া ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করে বলে সব ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারে না। এভাবে আমরা উদ্দীপকের আতর বানুর সঙ্গে চেতনাগত দিক থেকে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটির সাদৃশ্য দেখতে পাই।

ঘ. উদ্দীপকে কাজল খালা ও 'নিমগাছ' গল্পে কবির অবস্থান ভিন্ন রকম দেখা যায়। কারণ কাজল খালা আতর বানুর দুর্দশা দূর করার চিন্তা করেছেন। আর কবি কেবল গাছের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন।

মানুষ সমাজে বসবাস করে। কিন্তু এই সামাজিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সকলের একরকম হয় না। কারো আচরণে থাকে মানবিক বিষয়, আর কেউবা শুধু সৌন্দর্যপিয়াসী। 'নিমগাছ' গল্প এবং উদ্দীপকে এরকম দুটি বিষয়ই প্রকাশিত হয়েছে।

'নিমগাছ' গল্পে সকলেই নিমগাছের নিকট থেকে উপকার পেতে চায়। নিমগাছের দুঃখের কথা কেউ ভাবে না। কিন্তু একদিন একজন ব্যতিক্রমধর্মী লোক এলেন। তিনি কবিরাজ নন, কবি। কবি সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি নিমগাছের পাতা ছিঁড়েন নি, ডাল ভাঙেননি বা ছালও তোলেননি। তিনি শুধু নিমগাছের রূপের সুধা পান করেছেন। উদ্দীপকে দেখা যায় আতর বানু বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর অনাদর-অবহেলায় সংসারের দিন অতিবাহিত করছিল, কাজল খালা এসে আতর বানুর দুর্দশা দেখে তাকে তার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

'নিমগাছ' গল্পের কবি ও উদ্দীপকের কাজল খালা একই রেখায় অবস্থান করেননি। কবি কেবল নিমগাছের রূপ ও সুধা পান করেছেন, নিমগাছের সেবা বা যত্নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, কাজল খালা নিজে আতর বানুর দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। আতর বানুকে তিনি নিজের কাছে রেখে মানুষ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই, আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের কাজল খালা ও 'নিমগাছ' গল্পে কবির অবস্থান সমপর্যায়ের নয়।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি একটি পাকুড় গাছ। জন্ম কোথায় কোন কালে আমার জানা নেই। দিগন্তবিস্তারী আমার শাখাপ্রশাখা। আমার শেকড়-বাকড় মাটির অনেক গভীরে বিস্তৃত। ক্লান্ত পথিক শ্রান্তি ফিরিয়ে নেয় আমার সুশীতল ছায়ায়। আমি ছায়া দিই, বাতাস দিই মানুষকে। কিন্তু কেউ কেউ আমার গায়ে গর্ত করে, ডাল ভেঙে ফেলে। আমি কষ্ট পাই। একদিন আমার কাছে একটা লোক আসে। আমার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। বলে, 'পৃথিবীর যত শান্তি এখানে।' আমি বুঝি, এ অন্য জাতের মানুষ।

ক. বনফুল কোন আঙ্গিকে গল্প লিখতেন?

খ. 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের পাকুড়গাছের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের সাদৃশ্য বর্ণনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের অন্তর্নিহিত ভাব নয় বরং একটি বিশেষ অবস্থাকে তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. গ ৭. গ ৮. ক

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচিতে যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান রচনা :

কাব্যগ্রন্থ	:	*অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক, ছায়ানট*;
উপন্যাস	:	*বাঁধনহারা, কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা*;
গল্প	:	*ব্যথার দান, রিক্তের বেদন*;
প্রবন্ধ	:	*যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী*।

ভূমিকা

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) থেকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এটি কাজী নজরুল ইসলামের 'যুগবাণী' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি রচনা। সাম্যবাদী চেতনার বিকাশ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং জাতীয় উন্নয়নে গণ-মানুষের উপেক্ষিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- দেশ ও জাতির উন্নতিতে নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভদ্রলোক-সমাজের মনের ও চিন্তার দীনতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থার এক বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

– রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না– যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত 'ছোটলোক'-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্য-গর্বিত তোমাদের 'ভদ্রলোকের' অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই 'ছোটলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও-যে আমাদেরই মতো মানুষ– সেও যে সেই এক আল্লাহ্-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,– তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে– আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের আভিজাত্য-গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা– (যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) মনে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগকে শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি ভারতে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? ইঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,– সে আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,– সে যে ডাকার মতো ডাক,– তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্রবাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো– দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া

এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি, –ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ বোধন-বাঁশিতে সুর দিই–

'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!' □

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অট্টালিকা– প্রাসাদ। **অধিবাসী–** নিবাসী; বাসিন্দা। **আভিজাত্য–** কৌলীন্য; বংশমর্যাদা। **উন্মেষ–** উদ্রেক; সূত্রপাত। **উপেক্ষা–** তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অযত্ন, অনাদর। **উৎপীড়ন–** উত্যক্তকরণ, জুলুম, অত্যাচার। **ওতপ্রোতভাবে–** বিশেষভাবে জড়িত; পরিব্যাপ্ত। **কর্ণপাত–** কান দেওয়া। **ক্লেশ–** দুঃখ; কষ্ট। ***চণ্ডাল–*** চাঁড়াল, হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্গের লোক। ***মসীময়–*** কালিমাখা; অন্ধকারাচ্ছন্ন। **দুর্ভাগা–** হতভাগা; অদৃষ্ট মন্দ এমন। ***দৈন্য–*** দারিদ্র্য; দীনতা। **বিদ্রোহাচরণ–** প্রচলিত বা বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করা। **বোধন–** জ্ঞান; অবগতি। ***বোধন-বাঁশি–*** বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি। **ব্যগ্র–** ব্যাকুল; আগ্রহযুক্ত; কৌতূহলী। **ভাস্বর–** দিবাকর; সূর্য; দীপ্তিমান। **যুগান্তর–** অন্য যুগ।

সারসংক্ষেপ :

ভদ্রলোকেরা যাদের 'ছোটলোক' বলে অবজ্ঞা করে, তারাই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। এরাই আসলে কাজের মানুষ। ভদ্রলোকেরা কথায় যত ওস্তাদ, কাজে তত নয়। অকারণ ঘৃণায় তারা নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষগুলোকেও কুণ্ঠিত করে রাখে। তাই দেশের উন্নতিতে অবদান রাখার লোকের এত অভাব। মহাত্মা গান্ধী এ কথা জানতেন। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ডাকে। যে বিপুল মানুষকে আমরা উপেক্ষা করছি, তাদের মধ্যে যদি বিশ্বাস জাগানো না যায়, যদি মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ না জাগানো হয়, তাহলে দেশ-জাতির উন্নতি অধরাই থেকে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোককে কি বলা হয়?
ক. ক্ষত্রিয় খ. ব্রাহ্মণ
গ. বৈশ্য ঘ. চণ্ডাল

২. মহাত্মা গান্ধী যে গুণের দ্বারা দেশের জনতাকে সম্মোহিত করেছিলেন–
ক. সন্ন্যাস খ. বাগ্মিতা গ. মানবতাবোধ ঘ. রাষ্ট্রভাবনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই–
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।

৩. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটি উঠে এসেছে?
ক. বর্ণভেদ খ. জাতিভেদ গ. মানবতা ঘ. কুটিলতা

৪. উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধ অনুসরণে মহাত্মা গান্ধী চরিত্রে যেটা নেই–
i. জাতিভেদ ii. বর্ণপ্রথা iii. ধর্মভেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কাজী নজরুল ইসলাম ছেলেবেলায় কীসে যোগ দিয়েছিলেন?
ক. লেটো গানের দলে খ. কবি গানের দলে
গ. পুথি গানের দলে ঘ. কীর্তন গানের দলে

৬. 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক যাদের হাত ধরতে বলেছেন–
ক. বিপ্লবীদের খ. উপেক্ষিত ভাইদের
গ. হরিজনদের ঘ. গণতন্ত্রকামীদের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ড. আম্বেদকর ব্রিটিশ ভারতে হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ধনী-গরীব, কুলি-মজুর, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

৭. উদ্দীপকের ড. আম্বেদকরের সঙ্গে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে চরিত্রের মিল রয়েছে–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. চিত্তরঞ্জন দাশ ঘ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে–
ক. সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে খ. সাম্যবাদ বিরাজ করবে
গ. অভিজাততন্ত্র বিরাজ করবে ঘ. গণতন্ত্র বিরাজ করবে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

ক. 'বোধন-বাঁশি' অর্থ কী?
খ. 'ছোট লোকের অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? –তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাবই যেন 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. বোধন-বাঁশি অর্থ বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি।

খ. 'ছোট লোকের অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' –উক্তিটি দ্বারা কাজী নজরুল ইসলাম কথিত ছোটলোকদের সরল মুক্ত উদার প্রাণের কথা বুঝিয়েছেন।

সমগ্র বিশ্ব আজ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। কাজী নজরুল ইসলাম সারা জীবন এই শোষিত শ্রেণির জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের সরল স্বচ্ছ মনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তাদের মনকে কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্তর বলেছেন।

গ. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জগতের সব মানুষ এক ও অভিন্ন– এই সত্যটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমাদের এই পৃথিবী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের বাসভূমি। এ ধরণীর স্নেহচ্ছায়ায় এবং একই সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে সকলেই আলোকিত। মানুষের মানবীয় অনুভূতি যথা শীতলতা, উষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সবারই এক ও অভিন্ন। অথচ সমাজে কেউ শোষক, কেউ শোষিত। কেউ ইটের পর ইট সাজিয়ে রক্ত ও ঘাম দিয়ে অট্টালিকা গড়ে,

কেউ তাতে সুখে নিদ্রা যায়– এ বৈষম্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এ বৈষম্য, এ পার্থক্য কৃত্রিম। সবার এক ও অভিন্ন পরিচয়– আমরা সবাই সানুষ।

উদ্দীপকে সারা পৃথিবীতে জাতি-বর্ণ-গোত্র পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে মানবসমাজ– তার জয়গান ফুটে উঠেছে। মানুষ হিসেবেই মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হওয়া উচিত– সাম্যের এই বাণী গুরুত্ব পেয়েছে। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও লেখক এটাই প্রত্যাশা করেছেন। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে মানবজাতি এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জয়গান করেছেন। ভদ্র সমাজ যদি তাদের তথাকথিত ছোটলোক বলে অবহেলা না করে মানুষ হিসেব মূল্য ও মর্যাদা দেয় এবং তাদের জেগে ওঠার সুযোগ দেয় তাহলে তারা জগতে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে। উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের এই ধারণাগুলোই ব্যক্ত হয়েছে।

ঘ. জগতের সব মানুষের এক ও অভিন্ন পরিচয়– আমরা সবাই মানুষ। এই চেতনা উদ্দীপক এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূল ভাব আর তা একসূত্রে গাঁথা।

পৃথিবীর নানা দেশে রয়েছে নানা জাতি। বিচিত্র তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় আলোকিত, একই লাল রক্ত তাদের শরীরে প্রবাহিত হয়। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সমানুষের পার্থক্য করা উচিত নয়।

উদ্দীপকে মানুষে মানুষে সাম্য ও মৈত্রীতে বন্ধনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম-বর্ণ জাতিভেদ ছাপিয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। তাই বিশ্বের এক মানুষ অন্য মানুষের আত্মীয় ও বন্ধু। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী মানসিকতার দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। ভদ্রলোকেরা যাদের ছোটলোক মনে করে তাদের অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হতে দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ তারাও মানুষ। সমাজে তাদেরও অধিকার রয়েছে। প্রাবন্ধিক তাদের মর্মবেদনা বোঝার মত মানসিকতা অর্জনের জন্যও তথাকথিত ভদ্র লোকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী যেমন করে নিম্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের মানুষদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন, তেমনি করে এ ছোটলোকদের ভালোবাসলে তাদের পক্ষে কঠিন কাজও করা সম্ভব । এই উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন হলে সাম্যবাদের বাণী ছড়িয়ে যাবে পুরো বিশ্বে। তখন পৃথিবীর মানুষ একই মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। উদ্দীপকের পঙ্‌ক্তিতেও এভাবটিই ফুটে উঠেছে। তাই, উদ্দীপকের মূল ভাব এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলভাব একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশে সমাজ বিপ্লবের অগ্রসেনানী। এদেশে প্রচলিত সামন্তবাদ ও দুর্বৃত্ত পুঁজির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতাকে। মাওলানা ভাসানী একাকার হয়ে গিয়েছিলেন মেহনতি জনতার কাতারে।

ক. বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি কোনটি?

খ. 'দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে।' –কারা এবং কিভাবে?

গ. উদ্দীপকের মাওলানা ভাসানী চরিত্রটি ' উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মাওলানা ভাসানী এবং মহাত্মা গান্ধীর চেতনা একইসূত্রে গাঁথা।" –উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. খ

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ ও মাতা ফতেমা খাতুন। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় কুমিল্লায় নানাবাড়িতেই তিনি বেড়ে ওঠেন। কুমিল্লার ইউসুফ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে চাকুরি করেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি তাঁর রচনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, মানবতাবোধ ও মানুষের জীবনাচরণের মৌলিক বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত ও উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে মহত্তম জীবনের সন্ধান করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর এবং মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন মূলত প্রবন্ধকার। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনা সংকলন করে '*সংস্কৃতি কথা*' (১৯৫৮) নামে একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ বের করেন। '*সভ্যতা*' ও '*সুখ*' তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর '*সংস্কৃতি কথা*' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা– একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আবার মানুষের জীবসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। জীবসত্তার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এ বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার কাজ জ্ঞান সৃষ্টি বা বিতরণ করা নয়; মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- মানুষের জীবদেহ আর মনুষ্যত্বের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়। শিক্ষার এ দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার

ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়– একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দু একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়– কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অর্থসাধনা– অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। **আস্বাদন–** রস গ্রহণ; স্বাদ গ্রহণ। ***উন্মোচন–*** উন্মুক্ত করা। **উত্থিত–** উৎপন্ন। ***কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?–*** খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না; এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ***জীবসত্তা–*** জীবের অস্তিত্ব। **জীবন সাধনা–** জীবন উন্নয়নের চেষ্টা। ***তিমির–*** অন্ধকার। ***নিগড়–*** শিকল; বেড়ি। **পরিচায়ক–** পরিচয় করিয়ে দেয় যে। ***পিঞ্জরবদ্ধ–*** খাঁচায় বন্দি। ***ক্ষুৎপিপাসা–*** ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। **প্রাচুর্য–** বাহুল্য; প্রচুরতা; আধিক্য। ***ফতুর–*** নিঃস্ব; সর্বস্বান্ত। ***বেড়ি–*** শিকল; শৃঙ্খল। ***মানবসত্তা–*** মানুষের অস্তিত্ব। মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। **অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি–** লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়। **মারফতে–** মাধ্যমে; দ্বারা। ***লেফাফাদুরস্তি–*** বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে ফাঁকি। ***হামেশা–*** প্রায়শই।

সারসংক্ষেপ :

মানুষের জীবন দোতলা ঘরের মতো। এর নিচতলা তার জৈবিক জীবন, আর উপরের তলা মনুষ্যত্ব। জৈবিক জীবনের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে হয়। কিন্তু মানুষের জন্য এটুকু যথেষ্ট নয়। মনুষ্যত্বই তার আসল পরিচয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটায়। মানুষের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মুক্তি – চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হলে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো দরকার যেন তা জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, আবার মূল্যবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে সেখানে মুক্তি নেই যেখানে–

i. চিন্তার স্বাধীনতা নেই ii. বুদ্ধির স্বাধীনতা নেই iii. আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

২. কীভাবে মানব জীবনের উন্নয়ন সম্ভব?

ক. অন্নবস্ত্রের সমাধান ও মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে খ. প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি পেলে

গ. মানব জীবনে সোনা ফলাতে পারলে ঘ. বড় জিনিস ত্যাগ করলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মজিদ লেখাপড়া শেষ করে চাকুরির পেছনে না ছুটে ব্যবসায় শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে বেশ কিছু টাকার মালিক বনে যায়। কিছুদিন পরে তাকে দেখা গেল শ্রীঘরে। লোকে বলে যে, তিনি খাদ্যে ভেজাল মেশাতেন।

৩. উদ্দীপকের মজিদ চরিত্র কোন প্রবন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ. পয়লা বৈশাখ

গ. বই পড়া ঘ. বাংলা শব্দ

৪. উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে মানুষের জন্য প্রয়োজন–

i. সুশিক্ষা ii. মনুষ্যত্ববোধ iii. সমাজচেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

ক. বঙ্গদর্শন খ. সভ্যতা

গ. স্বপ্নদর্শন ঘ. শিখা

৬. মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হচ্ছে–

i. ইতিহাস ii. বিজ্ঞান iii. শিক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বিলাতফেরত রাফিন সাহেব একজন আদর্শ মানুষ। তিনি মনে করেন শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা । শিক্ষা জ্ঞান দান নয় বরং মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় মাত্র।

৭. উদ্দীপকের বক্তব্য যে রচনায় প্রকাশিত হয়েছে–

ক. নিরীহ বাঙালী খ. মানুষ মুহম্মদ (স.)

গ. উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৮. উদ্দীপক ও আপনার পাঠ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে–

i. লোভী মানসিকতা ii. অর্থচিন্তার প্রসারতা iii. মূল্যবোধের প্রাধান্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ইমদাদুল হক একজন বাস্তববাদী শিক্ষক। জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেন। তিনি বলেন, মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। বস্তুত শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

ক. জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান কী?

খ. শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে?

গ. উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের চিন্তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিককে তুলে ধরেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।" –উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান হল শিক্ষা।

খ. জীবসত্তার ঘর থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা।

মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সে ঘরের নিচতলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব সে ঘরের উপরের তলা। শিক্ষাই জীবসত্তাকে মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। তবে জীবসত্তার ঘরেও তার

কাজ করতে হয় অর্থাৎ মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

গ. উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের চিন্তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলনে শিক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেছে। মানুষের পার্থিব জীবনে দুটি সত্তা রয়েছে– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা আসে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজ হয়। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের মতে, মানুষের জীবনে এ মূল্যবাধ তথা মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলিত হলে সে আলো ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র। মনুষ্যত্বের সে আলো প্রজ্জ্বলিত হবে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি মানবজীবনে অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টিই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা। –উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

মানুষের জীবনে দুটি সত্তা– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা আসে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজ হয়। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। আর এর বিকাশ ঘটে মানুষের আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধে। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলিত হলে সে আলো ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র। মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা বা জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবে আসে। আর যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষাও নেই।

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্বের স্বাদ লাভ করা যায়। এর জন্য অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থারও প্রয়োজন। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো, কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়। তাই অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় তাই মনুষ্যত্ব। আর তাই শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুক্তচিন্তার মানুষ বলে জনাব সালেহিনের শিক্ষিত সমাজে পরিচিতি রয়েছে। তিনি মনে করেন, মানুষের মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। এর একটি মানুষকে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা, আর অন্যটি হচ্ছে শিক্ষার সাহায্যে তার মনুষ্যত্বের সাধনা। এ দুটি উপায়ে চেষ্টা করা হলে মানব জীবনে উন্নয়ন সম্ভব।

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্যে কার প্রভাব লক্ষণীয়?
খ. 'অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী।' –কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীকের সঙ্গে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মিলগুলো তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের একটি বিশেষ অংশকে ধারণ করেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ঘ

মমতাদি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর ডাকনাম মানিক এবং পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁদের আদিনিবাস ছিলো বাংলাদেশে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকুরির কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিলো মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি ৪২টি উপন্যাস ও দুই শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর '*পুতুল নাচের ইতিকথা*' ও '*পদ্মানদীর মাঝি*' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

উপন্যাস	:	*জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংসা, চিহ্ন*;
ছোটগল্প	:	*অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, বৌ, সমুদ্রের স্বাদ*;
কবিতা	:	*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*;
প্রবন্ধ	:	*লেখকের কথা*।

ভূমিকা

'মমতাদি' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*সরীসৃপ*' (১৯৩৯) গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। গল্পটিতে শৈশবে মনুষ্যসত্তার বিকাশে স্নেহ-ভালোবাসার গুরুত্ব, পেশা, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আত্মমর্যাদাবোধের নমুনা এবং গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মমতাদি' গল্প পড়া শেষে আপনি–

- মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বিশিষ্ট পরিচয় লিখতে পারবেন।
- মানবিক সম্পর্কের এক সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।
- সব দিক রক্ষা করে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষাকারী মমতাদির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মমতাদিদির ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- গল্পকথক কিশোরটির সাথে মমতাদির সুন্দর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শীতের সকাল। রোদে বসে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে বসে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনার রান্নার জন্য লোক রাখবেন? আমি ছোট ছেলে-মেয়েও রাখব।

নিঃসঙ্কোচ আবেদন। বোঝা গেল সঙ্কোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সঙ্কোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরনে সেলাই করা ময়লা শাড়ি, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষত-চিহ্ন-আন্দাজে পরা টিপের মতো।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনী?

চমকে তার মুখ লাল হলো। সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধহয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনী। আমায় রাখবেন? আমি রান্না ছাড়া ছোট ছোট কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

পনের টাকা মাইনে ঠিক হলো। সে বোধহয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দুচোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন? রান্নাঘর দেখবে না? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখবো, বলে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল না, আমায় তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেল। ওকে আমার ভালো লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু, আমি ক্ষুণ্ন হয়ে মার কাছে গেলাম। একটা বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ়!

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে? ভাবিস না, তোকে খুব ভালোবাসবে। বার বার তোর দিকে এমন করে তাকাচ্ছিলো!

শুনে খুশি হলাম। রাঁধুনী পদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ করে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করল– অনর্থক প্রশ্ন করল না, নির্দেশের অভাবে কোনো কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এবাড়িতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিখুঁত হলো তার কাজ।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুশি হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে সে যে আমায় খুব ভালোবাসবে তার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ন। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার পাঁচ বার রান্না ঘরে দিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালোবাসল না। বরং রীতিমতো উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার করে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দুএকটি দরকারী কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতোই স্ণ্ঢানিমার ঐশ্বর্যে মহীয়সী কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্বিকার।

রাগ করে আমি স্কুলে চলে গেলাম। সে কি করে জানবে মাইনে করা রাঁধুনীর দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ির ছোটকর্তা ছটফট করেছে!

সপ্তাহখানেক নিজের নতুন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুনছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধহয় অসুখ হবে, আর খেয়ো না। কেমন?

ভর্ৎসনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম। এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসে জল খাবে।

বাড়ির সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি–

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কি হলো বামুনদি?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলো না খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোট এক নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথম ভারি লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব কথোপকথন মনে করে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে একরকম জড়িয়েই ধরে ছিল, হাত সরিয়ে ধরা পড়া চোরের মতো হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল, দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন করে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে।

তখন বুঝিনি, আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,– যদি কেবল মুখ কালো করে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনের টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললে, ও ওইরকম। সারাদিন বকবক করে। বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।

বলে মা চলে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে ঝরে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়তো শুকনোই থাকত, সম্মানে, চোখের জল ফেলল! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধহয় তার সইল না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনাড়ম্বর– জাঁকজমকহীন। **অনাহারে–** আহারের অভাবে বা খাদ্যের অভাবে। **অপ্রতিভ–** অপ্রস্তুত; হতবুদ্ধি। **আস্কারা–** প্রশ্রয়। **উপেক্ষা–** তুচ্ছ তাচ্ছিল্য; অযত্ন। **কৃতজ্ঞ–** যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে। **ক্ষিপ্রতা–** দ্রুত কার্য সম্পাদন। **তৎক্ষণাৎ–** সাথে সাথে। **দুর্বোধ্য–** যা বুঝতে পারা কঠিন। **নিঃসঙ্কোচ–** সংকোচ শূন্য; কুণ্ঠাহীন। ***পরদিন থেকে সে আর আসত না–*** না আসার কারণ আত্মসম্মান; মমতাদি টাকার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সত্য, কিন্তু তাকে অসম্মান করলে বা সন্দেহের চোখে দেখলে নিজে অপমানিতবোধ করে চাকরিত্যাগের সাহস তার ছিল। ***পর্দা ঠেলে উপার্জন–*** এখানে নারীদের অন্তঃপুরে থাকার প্রথাভঙ্গ করে বাইরে এসে আয়-রোজগার করা বোঝাচ্ছে। ***বাছা–*** বৎস বা অল্পবয়সী সন্তান। ***বামুনদি–*** ব্রাহ্মণদিদির সংক্ষিপ্ত রূপ। আগে রান্না বা গৃহকর্মে যে ব্রাহ্মণকন্যাগণ নিয়োজিত হতেন তাদের কথ্যরীতিতে বামুনদি ডাকা হতো। **বিশীর্ণ–** বিশেষ ভাবে শীর্ণ বা দুর্বল। **বিস্মিত–** অবাক, চমৎকৃত। **ভর্ৎসনা–** তিরস্কার। **রূঢ়–** কর্কশ, কঠোর।

সারসংক্ষেপ :

মমতা ভদ্রঘরের মেয়ে। আর্থিক অনটনে পড়ে অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছে। তার কাজের হাত ভালো। আচরণ সংযত। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে যথেষ্ট সতর্ক। কারো করুণাও চায় না, বাড়তি মনোযোগও চায় না। কাজের ও আচরণের সৌন্দর্যে সে সবার ভালোবাসা অর্জন করল। বাড়ির ছোট ছেলেটি তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে ভাই-বোনের মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে নিজের মর্যাদা যেন রক্ষিত থাকে, সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?
ক. নিশীথকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খ. নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শশীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'উনি রাগ করে'– এখানে 'উনি' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?
ক. মমতাদির প্রতিবেশী খ. মমতাদির স্বামী
গ. মমতাদির ছেলে ঘ. মমতাদির বোন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নদী-ভাঙনে নিঃস্ব সুরেশ সম্প্রতি পৌরসভায় ঝাড়ুদারের কাজ নিয়েছে। তাই বলে কেউ তাকে অসম্মান করে না। সেও সবাইকে শ্রেণিমত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে।

৩. উদ্দীপকের সুরেশের সঙ্গে কোন চরিত্রটির মিল রয়েছে?
ক. মমতাদি খ. গল্পকথকের মা
গ. গল্পকথকের প্রতিবেশী ঘ. গল্পকথক

৪. উদ্দীপকের সুরেশ ও গল্পের মমতাদির মধ্যে সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে যে বিষয়ে–
i. কর্মনিষ্ঠা
ii. সততা
iii. জীবন সংগ্রাম

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মমতার অসুখী দাম্পত্য জীবনের পরিচয় লিখতে পারবেন।
- মমতার বাড়ির অসহনীয় গরিবির বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রতিকূলতার মধ্যেও কীভাবে মমতা নিজের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষা করেছে, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

তিন চার দিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হয়, আঙ্গুলের দাগ। মাস্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙ্গুলের দাগ কেন? কে চড় মেরেছে?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়া বলল, দূর! তারপর হেসে বলল, আমি নিজে মেরেছি! কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে–

মশা মারতে গালে চড়! বলে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদবুদফাটা বাষ্পে কি দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নিচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলছ দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি না। কে মারবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হলো। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠার আনা আছে! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ওকথা ঘোষণা করে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপি চুপি বলল, কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দিলাম আমি?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারী নামাতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়া একরাশি চুল মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বৈকি। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস করে ছোট ছেলেকে শোনানো; কারও কাছে যা পাই না তুমি তা দেবে কেন? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড় রহস্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেয়নি! ভেবেচিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণী পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ করে দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হলো সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরি হলে তুমি কি করবে?

তুমি কি করতে বল? হরির লুট দেব? না তোমায় সন্দেশ খাওয়াব।

ধেৎ তা বলছি না। তোমার বরের চাকরি নেই বলে আমাদের বাড়ি কাজ করছ তো চাকরি হলে করবে না?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে!

তোমার বরের চাকরি হয়েছে।

হয়েছে বলে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা স্বামীর চাকরি নেই বলে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরির জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার চাকরি হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরি হয়েছে?

সে স্বীকার করে বলল, হয়েছে। বেশি দিন নয়, ইংরাজি মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক করে দিতে পারছ না বলে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছ? তার কোনো দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এবেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরি হয়েছে তবু?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরি, তাতে কুলবে না মা। আমায় ছাড়বেন না। আমার কাজ কি ভালো হচ্ছে না?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবে না মা। সেজন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কি হয় খোকা?

মিথ্যে বললে কি হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যে বললে?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশি পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি! কাঁদছ কেন?

তখন তার চাকরির একমাস বোধহয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলা লেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছ নেই টের পেয়েও এক রকম জোর করেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দুটি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল! গলিটা আস্ত ইট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। দুদিকের বাড়ির চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না?

সাতাশ নম্বরের বাড়িটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যত ক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোট একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নিচে ঘরের সংখ্যা বোধহয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যেভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোট ছোট কুঠরির বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রনের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লার ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘরে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই শোবার ঘর করে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশি মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনি অবস্থান যে আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসা যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিসই প্রায় এঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কম দামী শ্রীহীন জিনিস। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড় চৌকি, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকির তলে একটি চরকা আর ভাঙ্গা বেতের বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তরালে হয়তো আরও জিনিস আছে। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাংক–

দুটিরই রঙ চটে গেছে, একটির তালা ভাঙ্গা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনের ঠিক ঊর্ধ্বে কোনাকুনি টাঙ্গানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণের মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙ্গা টেবিল, আগাগোড়া দড়ির ব্যান্ডেজের জোরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্প দামী টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আর্সি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিস। টেবিলের ঊর্ধ্বে দেওয়ালের গর্তের তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে আর একটি জিনিস ছিল– একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকিতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিল, তারপর গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিশ টেনে বার করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথার তলে বালিশ দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি তো রাগ করে– কই, তুমি লেবু খেলে না।?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ করে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেব না, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম!

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল, কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মতো ভালোবাসত!

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, পানি তুলল, তারপর মশলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ি যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে। □

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্তরালে– আড়ালে। **কৃতার্থ–** সফল; ধন্য। **দীনতা–** দারিদ্র্য। **প্রাচীর–** দেওয়াল। **সন্তর্পণে–** অতি যত্নে; অতি সাবধানে। **সন্দিগ্ধ–** সন্দেহযুক্ত। ***হরির লুট–*** হিন্দুদের হরি-সংকীর্তনের পর ভক্তদের মধ্যে হরির নামে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়া।

সারসংক্ষেপ :

মমতার গালের দাগ থেকে বোঝা যায়, সে স্বামীর নির্যাতনের শিকার। কিন্তু সে কথা কারো কাছে সে স্বীকার করে না। স্বামীর চাকরি হওয়ার পরেও সে গৃহপরিচারিকার কাজ ছেড়ে দেয় না। এ থেকে তার পরিবারের দারিদ্র্য আর স্বামীর অসহযোগিতার বিষয়ে ধারণা হয়। এক নোংরা গলিতে ছোট্ট ঘরে সে থাকে। দমবন্ধ পরিবেশ। অতিথি আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষা করে সমস্ত পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামলানোর ক্ষমতা আছে মমতাদির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. মমতাদির ঘরে কয়টি ট্রাংক আছে?
ক. পাঁচটি খ. চারটি গ. তিনটি ঘ. দুটি

৬. মমতাদি অপরের বাড়িতে কাজ নেয় যে কারণে–
ক. অধিক উপার্জন প্রত্যাশী খ. স্বামীর চাকরি নেই
গ. লজ্জাহীন মনোভাব ঘ. গল্পকথকের মায়ের অনুরোধে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শমীর স্বামী হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ায় তাকে চাকরি নিতে হয় পাশের মুন্নু এ্যাপারেলস্-এ। পরবর্তী সময়ে স্বামী চাকরি ফিরে পেলেও সে আর চাকরিটা ছাড়তে চায়নি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন গল্পের মিল রয়েছে?
ক. আম আঁটির ভেঁপু খ. বাঁধ গ. মমতাদি ঘ. পালামৌ

৮. উদ্দীপকের শমী ও গল্পের মমতাদির মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. দুজনই কর্মঠ নারী ii. দুজনই আত্মপ্রত্যয়ী iii. দুজনই অল্প আয়াসে ধনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'মমতাদি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত ?

ক. সরীসৃপ খ. সহরতলী গ. জননী ঘ. চতুষ্কোণ

১০. 'আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন ?'– বাক্যটি দ্বারা কী বোঝায়?

ক. অনুসন্ধান খ. বিস্ময় গ. অনুজ্ঞা ঘ. জিজ্ঞাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পথে দেখি এক পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল– একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হতো।'

১১. উদ্দীপকের আবদুর রহমান 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. গল্পকথক খ. মমতাদি গ. মমতাদির স্বামী ঘ. গল্পকথকের মা

১২. উদ্দীপকের আবদুর রহমান আর মমতাদির চরিত্রে ফুটে উঠেছে–

ক. কর্মনিপুণতা খ. কর্মদক্ষতা গ. দায়িত্বশীলতা ঘ. অভিনয় প্রবণতা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তরাই নদীর তীরে একটি ইটের ভাটায় কাজ করে গোবিন্দ। সে সেখানে কাজ করে বেশ ভালোভাবে। সবার সঙ্গে তার ভদ্র আচরণ। তার সততা ও ভদ্র আচরণ সত্ত্বেও ইট ভাটার মালিক তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। ঠিকমতো তাকে বেতন দেয় না। নিরীহ গোবিন্দ নীরবে সকল কিছু সহ্য করে যায়।

ক. মমতাদির বয়স কত?

খ. 'পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছেন।' –কে এবং কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পে রয়েছে আলাদা রকমের বাস্তবতাবোধ।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার মহান দার্শনিক প্লেটো। তিনি অবলোকন করেছেন যে, মানব চরিত্রের সুন্দর বিকাশ আর মহৎ গুণাবলীর সমাবেশে তার অনন্য পরিচয় ফুটে উঠে। এজন্য তাকে কর্মমুখর জীবন যাপন করতে হয়। কর্মময় জীবনের বিচিত্র ও মহৎ অবদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের গৌরবময় বিকাশ সাধিত হয়।

ক. মমতাদির গালে কয়টি দাগ ছিল?

খ. 'মমতাদি' গল্পকথককে বাইরের রোয়াকে বসাল কেন?

গ. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের সাযুজ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মানুষের গৌরব নিহিত রয়েছে তার কর্মময় জীবনে।" –উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. মমতাদির বয়স ২৩ বছর।

খ. সংসারে দারিদ্র্যের কারণে মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছেন।

স্বামী আর ছেলেকে নিয়ে মমতাদির সংসার। চার মাস ধরে তার স্বামীর চাকরি নেই। সংসারে অভাব। কোনো মতেই সংসার আর চলছে না। তাই বাধ্য হয়ে পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য মমতাদি বাইরে এসেছেন।

গ. উদ্দীপকের গোবিন্দের সাথে মমতাদির সাদৃশ্য রয়েছে চাকুরির ধরন ও চাকুরিতে তাদের মনোনিবেশে।
দারিদ্র্যের কারণে অনেক সময় মানুষকে প্রত্যাশার চাইতে ছোট কাজ করতে হয়। তাই বলে তার সম্মানহানী হয় না। নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মগুণে সে সকলের মন জয় করতে পারে। এভাবে সে তার কর্মে একটি মর্যাদাজনক অবস্থান তৈরি করতে পারে। উদ্দীপকের গোবিন্দ ও গল্পের মমতাদি এই শ্রেণির চরিত্র।
মমতাদি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। সে গৃহকর্মী হিসেবে নীরবে কাজ করে যায়। মনিব যে ভাবে উপদেশ দেয় ঠিক সে ভাবে সে কাজ সম্পন্ন করে। যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, সেক্ষেত্রে সে অনর্থক প্রশ্ন না করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তা সমাধান করে ফেলে। উদ্দীপকের গোবিন্দও ইট ভাটায় চাকরি করে। সে সবার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কর্মীর অবস্থান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। কর্মী হিসেবে 'মমাতাদি' গল্পের মমতাদি এবং উদ্দীপকের গোবিন্দ একই রকমের চরিত্র।

ঘ. উদ্দীপকের বাস্তবতা ও মমতাদি গল্পের বাস্তবতা আলাদা।
মানুষ তার জীবনকে প্রকাশ করে কর্মের মাধ্যমে। কর্মময় জীবন তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। সে তার জীবনকে কর্মময় জীবনের বৈচিত্র্য ও মহৎ অবদানের মাধ্যমে বিকশিত করে তোলে। ফুটে উঠে তার অনন্য পরিচয়। আলোচ্য উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পে তারই পরিচয় পাই।
'মমতাদি' গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মমতাদির প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে গৃহকর্মের কাজে একজন গৃহকর্মীর আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা, দক্ষতা ও পরিমিত ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে একজন ইট ভাটার শ্রমিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের বাস্তবতা ও গল্পের বাস্তবতা ভিন্ন।
উদ্দীপকে গোবিন্দ ইট ভাটায় কাজ করলেও সে সবার সাথে ভদ্র ব্যবহার করে এবং সততার সাথে কাজ করে। তবে মালিক তাকে উপযুক্ত মাইনে দেয় না বরং তার সাথে খারাপ আচরণ করে। পক্ষান্তরে 'মমতাদি' গল্পের বাস্তবতায় ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। মমতাদি অভাবের তাড়নায় পর্দা ঠেলে বাইরে এসে অন্যের গৃহে কাজ করে, তার সততা ও কর্মদক্ষতায় বাড়ির লোকজন খুশি। সবাই তার সাথে ভালো আচরণ করে। আর মমতাদি যে কোন পরিস্থিতিতে নির্দেশ ছাড়াই নিজের মত কাজ করে এবং পরিবারের সবার ভালোবাসা ও সম্মান লাভ করে। তাই, উদ্দীপক ও মমতাদি গল্পের বাস্তবতা আলাদা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে বিকালে হাজির হলুম ঐশীবুর বাড়িতে। বুবু আমাকে দুটো পেয়ারা খেতে দিলেন। আমি একটা খেলাম। বুবু আমার খাওয়া দেখে বললেন, ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি বললাম, তাহলে আর একটা পেয়ারা খাই। বুবু হাসলেন, এ হাসি যেন কতকালের জমানো কষ্টের। বললেন, খুশি হয়েছি। সবাই যদি তোর মতো ভালোবাসত।

ক. কত বৎসর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন?
খ. 'বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের বুবু চরিত্রটি 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে ? –আলোচনা করুন।
ঘ. 'উদ্দীপকের বুবু ও মমতাদির অপত্য স্নেহ যেন একইসূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. খ ১২. গ

পয়লা বৈশাখ

কবীর চৌধুরী

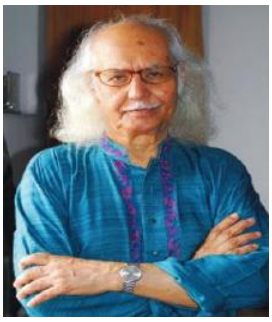

লেখক-পরিচিতি

জাতীয় অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, লেখক, সংস্কৃতি ও সমাজকর্মী কবীর চৌধুরী ১৯২৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী ও মাতা আফিয়া বেগম। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীর চাটখিল থানার গোপাইরবাগ গ্রামের মুন্সীবাড়ি। তাঁর স্ত্রী মেহের কবীর ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। কবীর চৌধুরী ১৯৩৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকায় সপ্তম স্থান ও ১৯৪০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ও ১৯৪৪ সালে স্নাতকোত্তর উভয়টিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সভাপতিসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তিনি শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতেরও বেশি। একদিকে বাঙালি পাঠকদের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা এবং অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা ছিলো তাঁর অনুবাদকর্মের অনন্য দিক। কবীর চৌধুরী আজীবন ছিলেন প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবক্তা। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। কবীর চৌধুরী ২০১১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

অবিস্মরণীয় বই, ছয় সঙ্গী, প্রাচীন ইংরেজি কাব্য সাহিত্য, আধুনিক মার্কিন সাহিত্য, সাহিত্য কোষ, পুশকিন ও অন্যান্য, অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম ও অন্যান্য, নজরুল দর্শন, ছোটদের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু, নির্বাচিত প্রবন্ধ, বিবিধ রচনা, মানুষের শিল্পকর্ম, স্মৃতিকথা, বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ প্রভৃতি।

ভূমিকা

কবীর চৌধুরীর 'পয়লা বৈশাখ' রচনাটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উৎসব : নববর্ষ' (২০০৮) নামক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে, যা মোবারক হোসেন সম্পাদনা করেন। সর্বজনীন উৎসব হিসেবে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নববর্ষের ইতিহাস ও বাংলা নববর্ষের সাথে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ঐক্যসূত্র সম্পর্কে লেখক এখানে ধারণা দিয়েছেন।

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- নববর্ষ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের রূপ-রূপান্তর বর্ণনা করতে পারবেন।
- শহরে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে আরো তাৎপর্যময় করার জন্য কী করতে হবে তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে, সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। অবশ্য উদ্‌যাপনের রীতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতি-প্রকরণের মধ্যে তারতম্য আছে, তবু সর্বক্ষেত্রেই একটি মৌলিক ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে। তা হল নবজন্ম বা পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনের ধারণা, পুরানো জীর্ণ এক অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। টেনিসন যখন বলেন :

রিং আউট দি ওল্ড, রিং ইন দি নিউ,
রিং, হ্যাপি বেলস্ এ্যাক্রস দি স্নো :
দি ইয়ার ইজ গোয়িং, লেট হিম গো,
রিং আউট দি ফল্‌স, রিং ইন দি ট্রু ॥

তখন তার মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ করি। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥
মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্‌ঝটিজাল যাক দূরে যাক ॥

তখন তার মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ করি। একজন বলেছেন, পয়লা জানুয়ারিকে উদ্দেশ্য করে, আরেকজন লিখেছেন পয়লা বৈশাখকে মনের মধ্যে রেখে, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবটি উভয়ক্ষেত্রেই এক।

পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব, তার অন্যতম জাতীয় উৎসব। এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। আবশ্য কালের যাত্রাপথ ধরে এর উদ্‌যাপন রীতিতে নানা পালাবদল ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন মাত্রিকতা অর্জন করেছে। সুদূর অতীতে এর সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্র ছিলো অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীন কৃষি সমাজের শীতকালীন নির্জীবতার পর নবজীবনের আবির্ভাবের ধারণার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বিষয়টি সম্পর্কিত ছিলো, একথা ভাবা অসঙ্গত নয়। এক সময় গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলা সব মানুষ, সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক, বাংলা নববর্ষের উৎসবে সোৎসাহে যোগ দিতো। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা, বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানা রকম খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলে সারা বছরের অন্যান্য দিনগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে এই দিনটি গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠতো। সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশি আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের নওরোজ বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারও বহু শতবর্ষ আগে থেকে বাংলা মানুষ নানাভাবে এই দিনটি পালন করে আসছে।

কিন্তু পালা বদলের কথা বলছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের দিনগুলোর এক পর্যায়ে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্যে এদেশের শোষিত ও পরশাসিত জনগণের চিত্তে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, যদিও সে সময়কার মুসলিম মানসে এর কোনো গভীর বা প্রত্যক্ষ অভিঘাত লক্ষ করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে অবলম্বন করে তার জাতীয়তাবাদী অনুষঙ্গের সঙ্গে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা যুক্ত হয়েছিলো, একটু লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে তৎকালীন নয়া উপনিবেশবাদী, ক্ষীণদৃষ্টি, ধর্মান্ধ, পাকিস্তানি শাসকবর্গ যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তা একইসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ও ন্যাক্কারজনক। তখন এ অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে একটি প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে পরম উৎসাহ ভরে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। এর

মধ্যে দিয়ে তারা তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তুলে ধরেছে, তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘোষণা করেছে, তাদের দীর্ঘদিনের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশেও এই দিনটি নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী মহলে হালখাতা ও মিঠাই বিতরণের অনুষ্ঠান তো আছেই। তার পাশাপাশি আছে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ও মেলার আসর, সঙ্গীতানুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সভা, বক্তৃতা-ভাষণ ইত্যাদি। তবে যে গ্রামবাংলা ছিলো পয়লা বৈশাখের আনন্দানুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র আজ অর্থনৈতিক কারণে শহরে, বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকায়, পয়লা বৈশাখকে উপলক্ষ করে এখন যে চাঞ্চল্য ও আনন্দ-উৎসব দেখা যায় তা নিতান্তই মেকি একথা বলা যাবে না, কিন্তু তার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিকের বুর্জোয়া বিলাস ও ফ্যাশনের একটি বড় অংশ কাজ করছে সেকথা মানতেই হবে। পয়লা বৈশাখকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে, শ্রমজীবী মানুষের আন্তরসত্তার সঙ্গে এর রাখীবন্ধনকে আবার নতুন করে বাঁধতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদের আজ বাংলা নববর্ষের মধ্যে সচেতনভাবে নতুন মাত্রিকতা যোগ করতে হবে। বাংলা নববর্ষের উৎসব যে বিশেষভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত, শ্রেণিগত অবস্থান নির্বিশেষে, সাধারণ মানুষের উৎসব, এর একান্ত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র যে অত্যন্ত তাৎপর্যময় আজ সেকথাটা আবার জোরের সঙ্গে বলা চাই। নিজেকে একবার একজন হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে ভেবে দেখুন, তাহলেই এর শভিনিস্টিক দিকটি বুঝতে পারবেন। অথচ এ অঞ্চলের ঐতিহ্য তো তা নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শক্তির সামনে স্বাধীন বাঙলার সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সিরাজদ্দৌলা শেষ বারের মতো লড়াই করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয়কে। আমাদের ঐতিহ্য তো মীর মদন ও মোহন লালের, তিতুমীর ও মঙ্গল পাণ্ডের, গোবিন্দ দেব ও মুনীর চৌধুরীর। তবে কেন এখন এর রকম ঘটছে? পাকিস্তানি আমলের ধর্মের নামে নৃশংসতার ইতিহাস ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ?

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অপরাজেয় শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করুক, এক হোক আমাদের শুভ কামনা। জয় পয়লা বৈশাখ।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনুষঙ্গ– প্রসঙ্গ; সম্বন্ধ। **অপরাজেয়–** পরাভূত করা যায় না এমন। **অবিচ্ছেদ্য–** বিযুক্ত বা খণ্ডিত করণের অযোগ্য। **আইন-ই-আকবরী**– বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত গ্রন্থ। **আন্তরসত্তা–** অকৃত্রিম অস্তিত্ব। ***উপনিবেশ–*** জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য দলবদ্ধভাবে বিদেশে যে বসতি স্থাপন করা হয়; Colony. **ঐতিহ্য–** লোকপ্রসিদ্ধি; পরম্পরাগত কথা। **ঔপনিবেশিক–** উপনিবেশ স্থাপনকারী। ***কৌতূহলোদ্দীপক–*** যাতে কোনো অজানা বিষয় জানার আগ্রহ বাড়ে। ***ক্ষীণদৃষ্টি–*** সংকীর্ণ দৃষ্টি। ***গৌরবমণ্ডিত–*** মহিমাময়; মর্যাদাপূর্ণ। ***জাতীয়তা–*** স্বজাতিপ্রীতি সংক্রান্ত। ***নওরোজ–*** নতুন দিন। পারস্য দেশের নিয়ম অনুযায়ী নতুন বছরের প্রথম দিন। ***নির্জীবতা–*** প্রাণশূন্যতা। **নৃশংসতা–** নিষ্ঠুরতা। ***ন্যাক্কারজনক–*** অত্যন্ত নিন্দনীয়; ধিক্কারজনক। ***প্রত্যক্ষ অভিঘাত–*** সরাসরি আঘাত; এখানে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে। ***বুর্জোয়া বিলাস–*** উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের শখ। ***রাখিবন্ধন–*** শ্রাবণ পূর্ণিমায় প্রিয়জনের ডান হাতে মঙ্গল কামনায় রাখি বেঁধে দেওয়ার উৎসব। ***শভিনিস্টিক–*** রুশ রাজনৈতিক মতবাদী। **স্বতন্ত্র–** ভিন্ন; পৃথক; স্বাধীন। **সংস্কৃতি–** কৃষ্টি। ***সামাজিক প্রকৌশলী–*** সমাজবিনির্মাণের কারিগর। ***সাম্রাজ্যবাদ–*** পররাজ্যের ওপর কর্তৃত্ববিস্তাররূপ রাজনৈতিক কূটকৌশল। ***স্বাদেশিকতা–*** দেশপ্রেমিকতা; ***সোৎসাহ–*** উৎসাহের সঙ্গে; আগ্রহসহকারে। ***হালখাতা–*** নতুন বছরের হিসাবনিকাশের জন্য নতুন খাতা আরম্ভের উৎসব।

সারসংক্ষেপ :

নববর্ষের একটা বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা হল: পুরনোকে বিসর্জন দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানো। বাংলা নববর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। একসময় কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। নববর্ষে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন হত। সময়ের পালাবদলে এর সঙ্গে রাজনৈতিক দিকও যুক্ত হয়। পাকিস্তানি শাসকপক্ষ বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা পেয়ে এ উদ্‌যাপন আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শোষণ আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে বাংলা নববর্ষ। বাংলা নববর্ষের যে একটা চমৎকার অসাম্প্রদায়িক দিক আছে, সে কথা মনে রাখলে আমাদের নববর্ষ পালন আরো বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা নববর্ষের কথা উল্লেখ আছে কোন গ্রন্থে?
ক. আইন-ই-আকবরী খ. তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী
গ. বাবরনামা ঘ. ফতোয়া-ই-আলমগীরী

২. 'শভিনিস্টিক' বলতে বোঝায়–
ক. রুশ জীবন পদ্ধতি খ. রুশ সংস্কৃতি চর্চা
গ. রুশ শিক্ষাব্যবস্থা ঘ. রুশ রাজনীতিক মতবাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষকে নববর্ষ উদযাপন করতে দেয়া হতো না। বলা হতো এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। ফলে পাকিস্তান আমলে নানা সময়ে বাঙালি জাতি ফুঁসে উঠেছে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'পয়লা বৈশাখ' রচনায় কোন শাসককে নির্দেশ করে?
ক. পাকিস্তানি খ. পাঠান
গ. রাজপুত ঘ. পাল

৪. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ' রচনায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–
i. ধর্ম পালনে বাধা
ii. উৎসব পালনে বাধা
iii. পাকিস্তানিদের ক্ষীণদৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বাংলা নববর্ষ বাঙালির কোন ধরনের উৎসব?
ক. ধর্মীয় খ. সামাজিক
গ. জাতীয় ঘ. পারিবারিক

৬. পয়লা বৈশাখ যে চেতনাকে ধারণ করে–
i. সাধারণ মানুষের উৎসব ii. বিশেষভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত iii. ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হালখাতা ও মিঠাই বিতরণ বাংলা নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এছাড়া রয়েছে বৈশাখি মেলা, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের আনন্দ আয়োজন। সাধারণ মানুষ শতবর্ষ আগে থেকে নববর্ষ উদযাপন করে আসছে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' রচনার মিল রয়েছে–
ক. নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতায় খ. মহরমের আনুষ্ঠানিকতায়
গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঘ. সাম্রাজ্যবাদী চেতনায়

৮. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ'প্রবন্ধে নববর্ষের যে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে–
i. আনুষ্ঠানিকতা

ii. শোভাযাত্রা
iii. ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সেই বাংলাদেশ ছিল সহস্রের একটি কাহিনি
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে; পূণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে ছাওয়া ঘরের আঙনে।

ক. 'স্বাদেশিকতা' শব্দের অর্থ কী?
খ. ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মধ্যে কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রই যেন শোভা পায় বাঙালির পয়লা বৈশাখ উদযাপনে।" –'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল অংশ-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'স্বাদেশিকতা' শব্দের অর্থ দেশপ্রেম।

খ. ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা হচ্ছে ভেদাভেদহীন ধর্ম চেতনা। যে চেতনা একক কোন ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে সকল ধর্মের উদার চর্চায় বিশ্বাস করে।

বাঙালির বাংলা নববর্ষ উদযাপন একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসবে জাতি, ধর্ম, গোত্র, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষ, সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যে ধর্মেরই হোক না কেন সবাই বাংলা নববর্ষের উৎসবে একসাথে অংশগ্রহণ করে। বিগত বছরের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার স্মৃতি মুছে ফেলে নব আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। তারা পরস্পর পরস্পরের আনন্দ ও কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বরণ করে নেয় বাংলা নববর্ষকে।

গ. বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে নানা বয়স, ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বজনীন এক জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণের বিষয়টিতে উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য দেখা যায়।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। একসময় গ্রাম-নগর নির্বিশেষে পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানা রকম খেলাধুলা, আনন্দ উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলিয়ে এ দিনটি আনন্দমুখর হয়ে উঠত।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে নববর্ষের দিন বাঙালির পালন করা উৎসবের কথা বলা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসবে আনন্দ করে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকেও বাঙালির উৎসবের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায় বাঙালির পালা-পার্বণে ঢাক- ঢোল বাজে। পূণ্যাহের উৎসবে সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠে। এদিক থেকে উদ্দীপকের বর্ণনা ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মিল রয়েছে। রঙ-বেরঙের নানা সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রেও উদ্দীপক ও'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার প্রকাশ হয়েছে।

একটি জাতির সকল মানুষ যখন বিশেষ কোনো চেতনাকে ধারণ করে তখন তাকে জাতীয় চেতনা বলা হয়। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসব। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখি মেলা ও লোকমেলার আয়োজন করা হয়। এ উৎসব কোন ধর্মের নয়, কোনো সম্প্রদায়ের নয়, এ উৎসব সকল বাঙালির।

উদ্দীপকের চিত্রে দেখা যায় নানা ধরনের মানুষ উৎসব উপলক্ষে একত্রে আনন্দ করছে। এটা তাদের জাতীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধেও এদেশের ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার সকল মানুষের একত্রে উৎসব পালন করার কথা বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে সব ধরনের মানুষ একই সঙ্গে দুঃখ-বিষাদ ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। প্রবন্ধে পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির একত্র হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে জাতীয় চেতনাটি উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের চিত্রেও উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মানুষের একত্রীকরণ দেখানো হয়েছে, যা জাতীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনাই অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পহেলা বৈশাখ। বাংলা বর্ষের প্রথম দিন। বাঙালির উৎসবের দিন। পহেলা বৈশাখ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতিবৎসরই বিপুল জনতা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এ শুধু আনন্দের উৎসব নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। বাঙালির নববর্ষ উৎসব অসাম্প্রদায়িক, ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং সর্বজনীন। পয়লা বৈশাখের চেতনা চিরজীবী হোক, এই আমাদের কামনা।

ক. কবীর চৌধুরী কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন?

খ. 'বুর্জোয়া বিলাস' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের যে বিষয়গুলো 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের চেতনা উদ্দীপকটি কিছুটা হলেও ধারণ করেছে।' –স্বীকার করেন কি? আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ঘ

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

লেখক-পরিচিতি

জাহানারা ইমাম ১৯২৩ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল আলী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা সৈয়দা হামিদা বেগম। জাহানারা ইমামের পারিবারিক নাম জুডু। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তিনি রংপুর থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৪ আইএ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৬০ সালে বিএড ডিগ্রি, ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল ও বুলবুল একাডেমির প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুমী শহিদ হন। রুমী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে জাহানারা ইমাম সহযোগিতা করেন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। তিনি হন শহিদ জননী। তিনি স্মৃতিচারণমূলক 'একাত্তরের দিনগুলি' লিখে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবিতে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

শিশুসাহিত্য	:	*গজকচ্ছপ, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, বিদায় দে মা ঘুরে আসি*;
অনুবাদ	:	*জাগ্রত ধরিত্রী, তেপান্তরের ছোট্ট শহর, নদীর তীরে ফুলের মালা*;
স্মৃতিকথা	:	*একাত্তরের দিনগুলি, ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস, প্রবাসের দিনগুলি*।

ভূমিকা

জাহানারা ইমাম রচিত 'একাত্তরের দিনগুলি' শীর্ষক দিনপঞ্জির আকারে রচিত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ থেকে পাঠ্যভুক্ত অংশটুকু গৃহীত হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনগুলিতে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা এবং জনজীবনের আতঙ্ক, দুর্ভোগ, আত্মত্যাগের কথা লেখক তাঁর এই রচনাটিতে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়া শেষে আপনি–

- সাহিত্যরূপ হিসেবে দিনপঞ্জির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অবরুদ্ধ ঢাকার সার্বিক আবহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষের আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিবরণ লিখতে পারবেন।
- একটি পরিবারের যুদ্ধকালীন অবস্থার সূক্ষ্ম পরিচয়লিপি তৈরি করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ ঢাকার বিবরণ লিখতে পারবেন।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানামাত্রিক নিপীড়নের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

১৩ই এপ্রিল : মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হলো, রোববার তো সারা দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে রোদ দেখা গেছে। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল, 'রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাঁক-শিয়ালির বিয়ে হয়।' কিন্তু আমার মনে পাষাণভার। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সামনে সোফায় বসে বলল, ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না ?'

'কোথায় যাব ? অন্ধ, বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব ? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোনো ভয় নেই !'

'নেই, মানে ? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো–'

'হল তো সব খালি, বিরান, যা হবার তাতো প্রথম দুদিনেই হয়ে গেছে। জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?'

'তাই নাকি ? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।'

'তাহলেই দেখ– ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।'

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, 'খুব দামি কথা বলেছেন ফুফুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান ? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।'

শিউরে উঠে বললাম, 'রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে।'

১০শে মে : সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছুদিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আজ সকালে নাশতা খাবার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ কটা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরনের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়– যা গত দুমাসে হয়নি। খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের 'পিস' অর্থাৎ 'শান্তি'। কালচে-মেরুর 'বনি প্রিন্স' আর 'এনা হার্কনেস'। ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের 'সিমোন' আর 'ল্যাভেন্ডার।' হলুদ 'বুকানিয়ার', সাদা 'পাস্‌কালি'।

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনো আমার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য আর নেই, ফুটে গেছে এবং প্রায় ঝরে পড়ার অবস্থা। 'পিস'-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে– যদিও সারাদেশ থেকে 'পিস' উধাও।

বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধ করি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে।

১২ই মে : বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার হুকুম হয়েছে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী– চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশ কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোনো ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণির ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি-যে যতটা পারি।

জামী তার দুতিনজন বন্ধুর সাথে ঠিক করেছে– ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশোনা করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় ওরা হাঁপিয়ে উঠবে না।

১৭ই মে : সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টিচার, রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাঁদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছে, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবকাশ– অবসর; বিরাম। **অবরুদ্ধ–** আটক; বেষ্টিত। ***অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তা–*** রুদ্ধ বা আটক অবস্থায় কর্মহীন। ***কূটকৌশল–*** চতুরতা; দুর্বুদ্ধি। ***খুরপি–*** মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার ছোট হাতিয়ার। ***গোয়েবলস (১৮৯৭-১৯৪৫)–*** জার্মানি বংশদ্ভূত হিটলারের সহযোগী; রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা রটনার প্রবর্তক। ***জামী–*** লেখিকার ছোট ছেলে। **নিষ্ক্রিয়–** ক্রিয়াহীন বা কাজহীন। **নিষ্পেষণ–** সম্পূর্ণরূপে চূর্ণকরণ; মর্দন। **পাষাণভার–** হৃদয়হীন অবস্থা। **পিস–** শান্তি। ***বিরান–*** জনমানবহীন; পরিত্যক্ত; ফাঁকা। **বিক্ষিপ্ত–** অস্থির; ব্যাকুল। **বিবৃতি–** বিবরণ; বর্ণনা; মতামত প্রকাশ। ***বেয়নেট–*** বন্দুকের সঙ্গিন; এখানে বন্দুকের অগ্রভাগে লাগানো একপ্রকার বিষাক্ত ও ধারালো ছোরা বোঝানো হয়েছে। **মুষলধারে–** অজস্র ধারায়; প্রচুর পরিমাণে। ***রুমী–*** জামীর বাবা। ***শরীফ–*** লেখিকার স্বামী। ***স্তম্ভিত–*** হতবাক; বিস্মিত।

সারসংক্ষেপ :

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা ঢাকায় থেকে গিয়েছিল বা থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ঢাকা তখন এক অবরুদ্ধ নগরী। চারিদিকে মৃত্যুর সংবাদ। হানাদার বাহিনীর বীভৎসতার চিহ্ন। স্বাভাবিক জীবনযাপনের কোনো উপায় ছিল না। সরকার অবশ্য প্রচার করেছে, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। তারা স্কুল-কলেজ চালানোর চেষ্টা করেছে। জোর করে টিভি-রেডিওতে অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের দিয়ে জোর করে বিবৃতি প্রচার করিয়েছে। এ এক আতঙ্কের সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'একাত্তরের দিনগুলি' কোন ধরনের রচনা?
ক. ভ্রমণ কাহিনি খ. রম্যরচনা
গ. গীতিনাট্য ঘ. স্মৃতিচারণমূলক

২. 'মুক্তিফৌজ' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক. মুক্তিবাহিনী খ. পাকিস্তানি বাহিনী
গ. আনসার বাহিনী ঘ. উপকূল রক্ষীবাহিনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন। রাজনীতির বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, কবিতাচর্চাই যার নেশা। তাকেও শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছে।

৩. উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় যাদের প্রতিনিধিত্ব করে–
ক. শিল্পী-বুদ্ধিজীবী খ. কৃষক-শ্রমিক
গ. জেলে-মাঝি ঘ. আউল-বাউল

৪. উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বুদ্ধিজীবীদের সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–
i. দেশপ্রেম ও স্বাধিকার চেতনায় ii. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে iii. পলায়নী মনোবৃত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আনন্দ ও বিষাদে মানুষের অনুভূতির সূক্ষ্ম পরিচয় লিখতে পারবেন।
- মানুষের আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধ-লড়াইয়ের নানা ধরন চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

২৫শে মে : মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধ্যার পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।'

দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেহ আহমদ নামটা আগে কখনো শুনি নি। রুমী বলল, 'নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

বললাম, 'হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।' এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদ পাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা কথিকা পড়লেন– চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে এক্কেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্তু এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।

শরীফ বলল, 'ঐ যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষে নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, এটা আলটিমেটাম।'

'কি জানি।'

জামী জানতে চাইল, 'গাজুরিয়া মাইর কি জিনিস?'

রুমী বলল, 'জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু কাউকে জিগ্যেস করে নেব।'

ঐ যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল– ঢাকার ছ'জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচে-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলারা প্রতিঘাতের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডারঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদ ঢাকাতেও?

মুক্তিফৌজ ! কথাটা এত ভারি যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর : রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে গত দুদিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কি করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধব নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হলো : যে কোন প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে– শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে 'তাই করা হোক' বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে – ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনী সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা। গত দুরাত শরীফ ঘুমোয় নি, আমি একবার বলেছি, 'তোমার কথাই ঠিক। ঐ খুনী সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।' আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, 'না, মার্সি পিটিশন কর।'

এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দুদিন দুরাত। শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে– না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

১১ই অক্টোবর : সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, 'সেই যে মাস খানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ুর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।'

'কী শুনে এলে ? কোথায় শুনলে ?'

'ডাঃ রাব্বির কাছে। রাব্বি– জানোতো, আমাদের সুজার ভাস্তে।'

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডাঃ ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, 'আজ ফকিরের অফিসে গেছিলাম, ওখানে রাব্বির সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিয়ুর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিয়ুর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেইখানে ৩০ তারিখে মতিয়ুরের চল্লিশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চল্লিশায়। মিসেস মতিয়ুর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরুজ্জামানের শালী।'

'আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও– এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়– মিলি এর নাম।'

ডলির কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জামান স্যার, ওদের কোনো খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে– কে জানে। ওপারেও যায়নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনতে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা- চেনা লেগেছিল, দু একদিন পরেই চিনেছিলাম– সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হলো আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়-রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়– এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৬ই ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল নটা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেলে তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাকিস্তানি আর্মি নাকি সারেন্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এলো সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাথাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মলিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক জখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ যদি সারেন্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।'

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ কে খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিনটের সময়। যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা বাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আলটিমেটাম– চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ। ***কথিকা–*** নির্দিষ্ট ও ক্ষুদ্র আকারের বর্ণনাত্মক রচনা। **কারফিউ–** নির্ধারিত সময়ে বাড়ির বাইরে বা রাস্তায় না যাওয়ার নির্দেশ। ***গাজুরিয়া মাইর–*** গজারি কাঠের মতো শক্ত ও ভারি কাঠের লাঠি দিয়ে মার দেওয়া। **গেরিলা–** আক্রমনকারী। ***চরমপত্র–*** মৃত্যুর পূর্বসময়ে লিখিত উপদেশ; শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পত্র; ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে হানাদার বাহিনীর অপকৃতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য নিয়ে হাস্যরসাত্মক কথিকা প্রচারিত হতো। এই কথিকাগুলো চরমপত্র নামে খ্যাত। **জন্মজয়ন্তী–** কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব। ***মার্সি পিটিশন–*** শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন; ক্ষমা ভিক্ষার আবেদনপত্র। ***লহমায়–*** মুহূর্তে। **স্ফুলিঙ্গ–** অগ্নিকণা; আগুনের ফুলকি।

সারসংক্ষেপ :

বিপর্যয় আর দুঃখের মধ্যে কখনো কখনো আনন্দের ঘটনাও ঘটত। বিশেষত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান বা মুক্তিফৌজের খবর মানুষকে আনন্দিত করত। তবে বিপর্যয়ের সংবাদই আসত বেশি। মতিয়ুর রহমান আর বেঁচে নেই বা মনিরুজ্জামান স্যারের পরিবারের কোনো খবর আজো পাওয়া যায়নি – এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই কেটেছে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। তবে লেখিকা সবচেয়ে বড় সংকটের মুখে পড়েছেন হানাদার বাহিনীর হাতে বড় ছেলে রুমী আটক হওয়ার ঘটনায়। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে বলেছেন কেউ কেউ। মায়ের মন শুরুতে এ প্রস্তাবে সায়ও দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর স্বামী সিদ্ধান্ত নেন, হানাদার বাহিনীর কাছে প্রাণভিক্ষা কিছুতেই নয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্যাগের এবং প্রতিরোধের; সেসঙ্গে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠারও বটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় মতিউর রহমানের পদবি ছিল কোনটি?
ক. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ. ফ্লাইং অফিসার
গ. এয়ার কমোডর ঘ. এয়ার মার্শাল

৬. 'না, মার্সি পিটিশন কর।'– উক্তিটিতে লেখকের কার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে?
ক. সন্তান খ. মা গ. সমাজ ঘ. সর্বহারা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ছোট কাকুকে রাজাকাররা সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় সম্ভবত মে মাসের পনের তারিখ। কাকুকে তারা গুলি করে মেরে ফেলে। রাজাকাররা খবর পাঠিয়েছিল লাশ আনার জন্য যেতে। কিন্তু দাদু ওপথে হাঁটেননি।

৭. উদ্দীপকের ছোটকাকুর সঙ্গে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. রুমী খ. জামি গ. শরীফ ঘ. সুজা

৮. উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে–
i. বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ ii. ত্যাগ ও দেশাত্মবোধ iii. স্বাধীনতার চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'আলটিমেটাম' শব্দের অর্থ কোনটি ?
ক. সময় নির্ধারণ খ. শেষ মুহূর্ত গ. সময় বাতিল ঘ. এক মুহূর্ত

১০. 'ভয়টা আসলে মনে।'–এখানে কীসের ভয়ের কথা বলা হয়েছে?
ক. মুক্তি বাহিনীর খ. সন্ত্রাসী বাহিনীর গ. পাকিস্তানি বাহিনীর ঘ. গোয়েন্দা বাহিনীর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বিশ্বাস করো, ছেলেটি স্বাধীনতা চেয়েছিলো
বাংলার স্বাধীনতা।'

১১. উদ্দীপকের ছেলেটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়?
ক. জামী খ. রুমী
গ. শরীফ ঘ. ফকির

১২. উদ্দীপকের ছেলেটি এবং 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখকের আকাঙ্ক্ষা –
i. বাংলার পরাধীনতা ii. বাংলার স্বাধীনতা iii. বাংলার স্বাধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র ভূমিকা অপরিসীম। বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন। এ বেতার কেন্দ্রে বাংলার লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, কলাকুশলী এবং শব্দসৈনিকেরাও জড়িত ছিলেন। বেতারের মাধ্যমে তাঁরা উন্নত চিন্তা, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবতাবোধের প্রচার করেছেন। বলাবাহুল্য যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে তার অনেকগুলোর নেপথ্যে রয়েছে শিল্পী, কুশলী আর বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রয়াস।

ক. গোয়েবলস্ কে?
খ. 'মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এ জন্যে।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন?
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন অংশের প্রতিফলন ঘটিয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চিঠিটা তার পকেটে ছিল
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।
'মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প করতে দেবে না
বলো মা,
তাই কি হয়?

ক. জেনারেল নিয়াজি কত হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন?
খ. 'এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দুই রাত।' –কে, কেন,একথা বলেছে?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "তারুণ্যের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই আমাদের একাত্তরের অর্জন স্বাধীনতা।" –উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. গোয়েবলস্ হলেন জার্মান বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ। তিনি হিটলারের সহযোগী এবং রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা রটনার প্রবর্তক ছিলেন।

খ. 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় নদীতে বহু মানুষের পচা লাশ ভেসে যাওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখক মাছ খাওয়া বাদ দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নদীতে বহু লাশ ভেসে যায়। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ। সদরঘাট ও সোয়ারিঘাটে সেই পঁচা লাশের দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না। এসব কারণে লেখক মাছ খাওয়া বাদ দিয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকের ভাবনা 'একাত্তরের দিনগুলি' দিনপঞ্জিতে আলোচিত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের ভূমিকার বিষয়টি উন্মোচিত করেছে।

ভারত থেকে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া গীতিকার, আবৃত্তিকার, শিল্পীসহ অনেকে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই বেতার থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল, পাশাপাশি অপারেশন চালানোর দিক্‌নির্দেশনাও দিত।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখতে স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে শিল্পী, কলাকুশলীসহ শব্দ-সৈনিকদেরও ভূমিকা ছিল। তাছাড়া তারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের উজ্জীবিত করে আসতেন। 'একাত্তরের দিনগুলি' দিনপঞ্জিতেও মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের নানা ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত রাখতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধকালীন

দিকনির্দেশনা বা মেসেজও এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সাংকেতিক ভাষায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠানো হত। তাই বলা যায় দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদানের দিকটিই উদ্দীপকটিতে উন্মোচিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র অনুভবকে ধারণ করে না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেতার মাধ্যম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এ সময় মানুষ বেতারের উপর নির্ভর করত। বেতারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথিকা, চরমপত্র, গণসঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ বেতারের মাধ্যমে সারা দেশের জনগণকে জানানো হত।

'একাত্তরের দিনগুলি' দিনপঞ্জিটিতে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াল অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আতঙ্কিত মানুষের উৎকণ্ঠিত জীবন-যাপন, হানাদারদের অত্যাচার, স্বাধীনতা অর্জনসহ অনেক বিষয় এখানে এসেছে।

উদ্দীপকে শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রসঙ্গ এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় পুরো মুক্তিযুদ্ধকালের আবহ ফুটে উঠেছে। সেখানে হানাদারদের নির্যাতন, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা, যুদ্ধকালীন মানুষের আতঙ্কিত জীবন যাপন, বুদ্ধিজীবী নির্যাতন, নির্যাতকদের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি দিক ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধকালের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী, শিল্পী ও শব্দ-সৈনিক তথা গীতিকারদের ভূমিকার কথা। এটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার নানা দিকের একটি খণ্ড দিক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র অনুভবকে ধারণ করেনি।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মেলাঘরে ট্রেনিংয়ে গিয়ে দেখি ঢাকার যত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমণ্ডি, গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরের বাপের ছেলেরা, সবাই জড়ো হয়েছে ওখানে। সবাই গেছে যুদ্ধ করার জন্য, এর বেশির ভাগ ঢাকার ছেলে। আমরা আছি সেক্টর টুতে। রেগুলার আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী হিসাবে।

১. 'চরমপত্র' কী?
২. 'গাজুরিয়া মাইর' বলতে কী বোঝায়?
৩. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির সর্বজনীন গণযুদ্ধ।" –উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. খ ১০. গ ১১. খ ১২. খ

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

বাঁধ

জহির রায়হান

লেখক-পরিচিতি

১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে জহির রায়হান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ কলকাতা ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আইএসসি পাস করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বোপরি চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি 'স্টপ জেনোসাইড' পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। এ-ছাড়াও তিনি আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তিনি বাংলা একাডেমি ও স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহিদ হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, আর কতদিন, কয়েকটি মৃত্যু*। এছাড়া তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন।

ভূমিকা

নেতৃত্ব, একতা, কর্মস্পৃহা যে সকল প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করতে পারে জহির রায়হান রচিত 'বাঁধ' গল্পে তা খুব সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির মানুষের ধর্ম ব্যবসার কথা লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জহির রায়হানের 'বাঁধ' গল্প পাঠ করলে আপনি–

- ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ বিড়ম্বনা আনতে পারে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিশ্রমের সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তনের যোগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সমাজে দুই ধরনের মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে পীরদের প্রতাপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের প্রবীণ মাতব্বর সমাজ আর নবীন শিক্ষিত সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাহেবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবে চিন্তে বললেন রহিম সর্দার। তাই করেন হুজুর, তাই করেন! একবাক্যে সায় দিল চাষীরা। গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষ রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবির মনোয়ার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু'দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে।

কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সব্জী। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা।

দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন তিনটি গরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর।

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুররা। বললে, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথা দাঁতে জিভ কাটলো জমির মুন্সি।

তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা! ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা! কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার। কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখা তো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারী। চাঁদা দিলে দিবা না দিলে নাই, এত বাহাত্তরী কথা ক্যান?

কিন্তু, বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হলো তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল, পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইলো?

কথা নয় হারামজাদা! জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জি উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। আল্লাহর ওলি, পীর দরবেশ; ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁরা। এই বলে নূহ নবী আর মহাপণ্ঢাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরি হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদী জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছ থেকে কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, এ্যাঁ! খোদার পীরের ঠাট্টা তামাসা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম্ব বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানী সুরত দেখে গাঁয়ে ছেলে বুড়োরা অবাক হলো। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে! ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই। গরিব মানুষ হুজুর! মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন। বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে।

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হলো। সারা রাত চললো তার একটানা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই। প্রতি বছর এ সময়ে শ্রাবণ মাসের 'ডাওর'। কেউ কেউ বলে বুড়ো বুড়ির 'ডাওর'। এই ডাওরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পুর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায় তাহলে সর্বনাশ! নির্ঘাত বন্যা!

'খোদা, রক্ষা কর! রক্ষা কর খোদা! রহম কর এই অধমগুলোর ওপর! কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমির ব্যাপারী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পীর সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তছবি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাকরেদরা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবতারণা– প্রস্তাবনা; ভূমিকা। **অলৌকিক–** মানুষের পক্ষে অসম্ভব; পৃথিবীতে ঘটে না এমন। **আয়ুষ্কাল–** জীবৎকাল। **ইতিবৃত্ত–** ইতিহাস। ***ওলাবিবি–*** প্রাচীন সমাজে পূজ্য কলেরা রোগের দেবী। ***কাফের–*** সত্য প্রত্যাখ্যানকারী; ইসলাম-বিরোধী লোক। ***তল্পিতল্পা–*** বিছানাপত্র বা অন্য জিনিসপত্রের বোঁচকা। ***নাফরমান–*** অবাধ্য; আদেশ অমান্যকারী। ***বাহাত্তরি কথা–*** বাহাত্তর বছর বয়স্ক শক্তিহীন অকেজো বৃদ্ধের সংলাপ; বাজে কথা। ***ভেংচি–*** উপহাসসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি। ***সাকরেদ–*** শাগরেদ; চেলা; সহকারী। **সন্তর্পণে–** অতি সাবধানে।

সারসংক্ষেপ :

প্রতি বছরই প্রবল বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে যায়। বন্যায় ভেসে যায় ফসল। ফসল হারানোর বেদনায় সবাই আহাজারি করে। কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয় না। এ বছরও বন্যার সময় ঘনিয়ে এসেছে। গ্রামের মাতব্বররা ঠিক করল, বন্যা ঠেকানোর জন্য গফরগাঁ থেকে পীরসাহেবকে নিয়ে আসবে। বাধা দিল মতি মাস্টার আর কলেজ-পড়ুয়া রশিদ। দোয়া পড়ে বন্যা ঠেকানো যায় – এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। মাতব্বররা রুষ্ট হলেন। এদের পাপে খোদায়ি গজব নেমে আসবে ভেবে শঙ্কিত হলেন। যথারীতি পীরসাহেব এলেন। দোয়া-জিকির চলতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জহির রায়হান কোন ধরনের জীবনের রূপকার?
ক. উচ্চবিত্ত খ. মধ্যবিত্ত
গ. উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘ. নিম্ন-মধ্যবিত্ত

২. 'পীর আইন্যা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইলো?' –উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. পীরের প্রতি ভালবাসা খ. সংস্কারমুক্ত চেতনা
গ. পীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘ. সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সরসপুরের পীর এসেছেন সফরে। কালু সর্দার বোকা নন। তিনি জানেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে।

৩. উদ্দীপকের কালু সর্দার 'বাঁধ' গল্পের কোন চরিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. জমির ব্যাপারী খ. মতি মাস্টার

গ. গনি মোল্লা ঘ. বুড়ো কাজী

৪. এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত যে বিষয়টিতে–

i. কুসংস্কারে ii. ধর্মভীরুতায় iii. পার্থিব লালসায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বহুজনের অংশগ্রহণে কীভাবে বাঁধ রক্ষা পেল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মান্ধ মানুষজনের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মনে আশা জাগে চাষিদের। আনন্দে চক্‌চক্ করে ওঠে কোটরে ঢোকা চোখগুলো। ভীড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, কই নাই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীর নয় খোদার খাস পীর!

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আর যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করলো কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। কিন্তু, থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু, মতি মাস্টার বিশ্বাস করলো না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বললো, ঝড় থামাবে ওই বুড়োটি? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?

হ্যাঁ, থামাবে। আলবত থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থন করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলোর গাঁ থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই।

কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে "ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বারবার সাবধান করছে। ঢল হইবো ঢল। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা। রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল।

হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন তিনি, খোদা!

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস। টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়লো ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, কে? ভয় নাই আমি মতি মাস্টার।

ব্যাপার কি? এ রাত্তির বেলা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ছকু। মতি মাস্টার বললো, যাও কনহানে?

যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?

না। স্বল্প থেমে মতি মাস্টার বললো। এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর। কোদাল দিয়া কি অইবো? রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি। যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বললো মন্তু শেখ।

এতক্ষণে পুরো দলটার দিকে চোখ পড়লো ছকু মুন্সির। একজন দুজন নয়, অনেক। অন্তত জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি।

মতি মাস্টার এত লোক জোটাল কেমন করে? কাজী বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাস্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে? ফল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?

মতি মাস্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি-গালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালো সে। খপ করে একখানা হাত চেপে ধরলে রশিদ, ছকু।

এই ছকা। ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা। ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়াল ছকু। খোদা সাবধান করছে তাদের। খবরদার যাইও না।

যাইও না মাস্টার। থামো, থামো! হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চল সবাই।

ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাস্টার। এখন কথা কইবার সময় না। জলদি চল।

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরুদের শব্দে ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরুদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মত ঊর্ধ্বে হাত তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক! হে রহমানের রহিম! তুমিই সব! তুমি রক্ষা কর আমাদের!

ওদিক মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাস্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না। তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা কিছুতেই। কখনই না।

ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙে পড়বে।

হায় খোদা! ঘরের বৌ-ঝিয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই তাই তা খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর ঢুলে ঢুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল!

সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাস্টার। কোদাল চালাও! আরো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে।

এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বললে, আলির নাম নাও ভাইয়া, আলির নাম নাও।

আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত। তারছে একডা গান গাও। গায়ে জোস আইবো।

মন্তু শেখ গান ধরলো।

গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়লো একটা কাছে কোথায়। কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাস্টারকে আর তার চৌদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

ঝুড়ি মাথায় বিড়বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু, হাত-পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাস্টারের গলার শব্দ শোনা গেল, আর ভয় নাই চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে! এতক্ষণে হাসি ফুটলো সবার মুখে। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পুব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালি ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্লণ্ঢ হয়ে উঠলো জমির বেপারী। ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে। ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো, সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙ্গে সাধ্য কি?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অশ্রাব্য– শোনা যায় না এমন। **আর্তনাদ–** কাতর চিৎকার; বিপদসূচক ক্রন্দনধ্বনি। **খরস্রোতা–** প্রবল স্রোত; অত্যন্ত বেগবান প্রবাহ। **ঝঞ্ঝা–** প্রচণ্ড ঝড়। **ফরিয়াদ–** অভিযোগ জানানো। **বিক্ষুব্ধ–** অত্যন্ত রাগান্বিত; বিচলিত। **বেদীন–** ধর্মহীন। **মৃদুমন্দ–** কোমল; মন্থর। **রক্তিমাভা–** লাল আভা যুক্ত। **রোখা–** বাধা দেওয়া।

সারসংক্ষেপ :

বেশিরভাগ মানুষ পীরসাহেবের দোয়া-জিকিরে অংশ নিচ্ছিল। এদিকে কয়েকদিনের টানা বর্ষণে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সে রাতে পীরসাহেব সবাইকে ডাকলেন মিলাদ পড়ার জন্য। আর মতি মাস্টার গ্রামের অন্তত পঞ্চাশজন লোক জড়ো করে বৃষ্টিতে ভিজে রওয়ানা দিলেন বাঁধের ভাঙন ঠেকানোর জন্য। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে মাটি কেটে তারা বাঁধের ভাঙন রোধ করতে সমর্থ হল। সকালবেলা মসজিদ থেকে লোক বেরিয়ে দেখল, বাঁধ ভাঙেনি। তারা ভাবলো, পীরসাহেবের কেরামতিই বুঝি তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পীর সাহেব গাঁয়ের সবাইকে কী জন্য ডেকেছিলেন?
ক. মিলাদ পড়ার জন্য খ. গজল গাওয়ার জন্য
গ. আজান দেয়ার জন্য ঘ. তসবিহ পড়ার জন্য

৬. ছকু ভয়ে আঁতকে উঠেছিল কেন?
ক. কাজির সঙ্গে তর্ক করায় খ. প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ায়
গ. অশ্রাব্য গালি-গালাজ শুনে ঘ. সকলের হাতে ঝুড়ি-কোদাল দেখে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বৃদ্ধ মকবুল শেখ নদীর ঘাটে গাছের গুঁড়ি নৌকায় টেনে তুলছেন। আর সকলকে চিৎকার করে বলছেন, "আলির নাম নাও ভাইয়া, আলির নাম নাও।"

৭. উদ্দীপকের মকবুল শেখ 'বাঁধ' গল্পের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে–
ক. মন্তু শেখ খ. মতি মাস্টার
গ. জমির ব্যাপারী ঘ. আয়নাল শেখ

৮. উদ্দীপক ও 'বাঁধ' গল্প অনুযায়ী আলির নাম নিলে –
i. কাজে মনোবল বাড়ে ii. কাজে অবসর পাওয়া যায় ii. অন্যের সহযোগিতা পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ওলা বিবি কে?
ক. কলেরা রোগের দেবী খ. বসন্ত রোগের দেবী
গ. মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী ঘ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী

১০. মতি মাস্টার জমির ব্যাপারীর বিরোধিতা করেছিল–
i. পীরকে ভেট দিতে হবে বলে ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে iii. কর্মই জীবনের মূলমন্ত্র বলে
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ইভান গ্রামে স্কুল করতে চায়। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করে ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবে, আলোকিত হবে। কিন্তু আমিন ব্যাপারি বলে– এইহানে পীরের দরগা বানাও। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। তবেই না সমাজের উন্নতি।

১১. উদ্দীপকের ইভান চরিত্রে 'বাঁধ' গল্পের কার প্রতিফলন রয়েছে?
ক. জমির ব্যাপারী খ. মতি মাস্টার
গ. মন্তু শেখ ঘ. রহিম সর্দার

১২. উদ্দীপকের আমিন ব্যাপারি ও 'বাঁধ' গল্পের গণি মোল্লার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. ধর্মভীরুতা
খ. ধর্মসচেতনতা
গ. ধর্মহীনতা
ঘ. ধর্মবিমুখতা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলার কারণে সয়ফুল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক বন্ধুর পরামর্শে সে পরিচিত হয় নবীপুরের পীরের সঙ্গে। পীরের কথাবার্তায় সয়ফুল মুগ্ধ হয়ে একসময় তাঁর মুরিদ হয়। তার পীরকে খেদমত করার সামর্থ্য নেই। তবু কল্যাণের প্রত্যাশায় একদিন তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সয়ফুলের স্ত্রী অবশ্য এ কাজটি একদম পছন্দ করে নি।

ক. 'ভেংচি' কী?
খ. 'তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব।' –কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?
গ. উদ্দীপকের সয়ফুলের স্ত্রী ও 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সীর বৈসাদৃশ্য কোথায়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "সয়ফুল এবং জমির মুন্সীর মতো লোকেরাই আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।" –উদ্দীপক এবং 'বাঁধ' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ নামে এক লোকের আবির্ভাব ঘটে। তার বক্তব্য, এই গ্রামের ঘন ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ শ্যাওলা-ধরা যে প্রাচীন কবরটি রয়েছে তা একজন মোদাচ্ছের পীরের। এরপর সে ঐ কবরের উপর লালসালু কাপড় বিছিয়ে দেয়। কবরকে অবলম্বন করে সে গুছিয়ে নেয় তার আয়-রোজগারের পথ। গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে নানা সংস্কারের কথা বলে, মাজারের ভয় দেখিয়ে সে শিকড় গাড়ে গ্রামটিতে। অবশ্য আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মজিদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে চায়।

ক. 'কাফের' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'এ ফসল নষ্ট হতে পারে না।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের মজিদ ও 'বাঁধ' গল্পের মনোয়ার হাজীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কি? –বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. "সংস্কারাচ্ছন্ন পীরপ্রথার কবল থেকে সমাজকে এগিয়ে নিতে আক্কাস ও মতি মাস্টারের মত অগ্রসর চিন্তার মানুষের প্রয়োজন।" –উদ্দীপক ও 'বাঁধ' গল্পের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. ভেংচি হল উপহাসসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি।

খ. দাবিকৃত চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে জমির ব্যাপারী মতি মাস্টারের বিরুদ্ধে উক্তিটি করেছিল।
গ্রামের পীরভক্তরা গফরগাঁও থেকে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে এলাকার বন্যা ঠেকানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করে পীর সাহেব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, মুমূর্ষু রোগীকেও তিনি বাঁচাতে পারেন। তবে তাকে আনতে গেলে, সোজা বাংলায় বলা যায়, টাকার প্রয়োজন। সবাই চাঁদা দিতে রাজি হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী আধুনিকমনস্ক মতি মাস্টার তার বিরোধিতা করে। জমির মুন্সির মতো লোকে মনে করে শিক্ষিত হয়ে এখনকার ছেলেরা মুরুব্বিদের মানে না, পীরদের শ্রদ্ধা করে না। তাই মতি মাস্টারের কথায় অনেকটা হতচকিত হয়ে জমির ব্যাপারী উক্তিটি করেছিল।

গ. উদ্দীপকের সয়ফুলের স্ত্রী ও 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য পীরবিশ্বাসে।
আমাদের সমাজে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশি থাকে। এর সুযোগ নেয় একশ্রেণির পীর, এরা ধর্মব্যবসায়ী। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য এরা অনেক সময় ধর্মের অপব্যাখ্যা করে। তাদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা অনেক সময় মূল ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে। উদ্দীপকের পীর এবং 'বাঁধ' গল্পের মনোয়ার হাজি এই শ্রেণির প্রতিনিধি।

উদ্দীপকে দেখা যায, সয়ফুল ব্যবসায়ে মার খেয়ে বন্ধুর পরামর্শে নবীপুরের পীরের মুরিদ হয় এবং তার সেবাযত্নের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পীরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু সয়ফুলের বাস্তববাদী স্ত্রী বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখে নি। তিনি মনে করেন পীর নয়, মেহনত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়। পীর কখনো ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না। পক্ষান্তরে, 'বাঁধ' গল্পে এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব হলে জমির মুন্সি গফরগাঁও হতে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে দোয়া-দরুদের মাধ্যমে বন্যা রোখার চেষ্টা করে । সে মনে করে আল্লার পীর ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে।

ঘ. ধর্মান্ধ সয়ফুল এবং জমির মুন্সীর মতো লোকেরাই আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

কুসংস্কার প্রতিটি সমাজে একটি সামাজিক ব্যাধি। মানুষের এই কুসংস্কার চেতনাকে কাজে লাগায় একশ্রেণির পীর। এভাবে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে। আর তাদের সহযোগিতা করে মুরিদ নামে একশ্রেণির পরগাছা টাইপের লোক।

উদ্দীপকে দেখা যায, ধর্মান্ধ সয়ফুল ব্যবসায়ে মার খেয়ে বন্ধুর পরামর্শে নবীপুরের পীরের মুরিদ হয়। পীরকে সেবাযত্নের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ঘরে নিজের স্ত্রী আছে– একথাটা তার মনে থাকে না। সয়ফুলের বাস্তববাদী স্ত্রী বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেনি। পক্ষান্তরে, 'বাঁধ' গল্পে দেখা যায়, এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটলে জমির মুন্সি গফরগাঁও হতে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে দোয়া-দরুদের মাধ্যমে বন্যা রুখবার চেষ্টা করে । সে মনে করে আল্লার পীর ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। মতি মাস্টার চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সে মতি মাস্টারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে। জমির মুন্সি সমমনাদের কাছে মতি মাস্টারদের মতো সংস্কারমুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। মুন্সি মনে করে, খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। তারপরে খোদা মুখ তুলে তাকাবেন। একসময় পীর মনোয়ার হাজি গ্রামে আসেন এবং খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। প্রসঙ্গক্রমে অসংখ্য আজগুবি ঘটনারও অবতারণা করেন তিনি।

মূলত 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সি ও উদ্দীপকের সয়ফুলের মত ধর্মান্ধ লোকদের সরলতা, প্রশ্রয় ও সমর্থনে আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভণ্ড পীরেরা সাধারণত খুব কৌশলী ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে। তারা মেধাশূন্য,এবং হুজুগে লোকদের বেছে নেয় পরগাছা সাজার জন্য। 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সি এবং উদ্দীপকের সয়ফুলেরা পীরদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে, আর ক্ষতির সম্মুখীন হয় সমাজের সকলে। এভাবেই তারা আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শিলার ছোটভাই সাদমান একটি কূপের কাছে খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাদু তাকে জ্বীনে ধরেছে মনে করে মসজিদের ইমামের কাছে তাবিজ আনতে যান। এতে শিলার মন সায় দেয় না। সে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তার স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে। শিলা সিদ্ধান্ত নেয় তার ভাইকে নিয়ে একজন চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হবে। অল্পক্ষণ পরেই সে বাবাকে নিয়ে হাঁটা দেয় চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে।

ক. 'নাফরমান' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'বাহাত্তরী কথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. 'বাঁধ' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. "মতি মাস্টারের সংস্কারমুক্ত চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের শিলা চরিত্রে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. ক ৯. ক ১০. গ ১১. খ ১২. ক

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

হায়াৎ মামুদ

লেখক-পরিচিতি

হায়াৎ মামুদ ২ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মৌড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মনিরুজ্জামান। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। দেশবিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে পিতার সঙ্গে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং বর্তমানে তিনি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর পিতা মুহম্মদ শমসের আলী এবং মাতা আমিনা খাতুন। হায়াৎ মামুদ ১৯৫৬ সালে ঢাকার সেন্টগ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯৫৮ সালে তৎকালীন কায়েদে-আজম কলেজ (বর্তমানে সরকারি হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন বাংলা একাডেমিতে চাকরি করেন এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি একজন আধুনিক কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক ও শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ রচনা তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি প্রায় অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

স্বগত সংলাপ, প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী, নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী, প্রতিভার খেলা– নজরুল, বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, কিশোর বাংলা অভিধান।

ভূমিকা

হায়াৎ মামুদ রচিত 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে বিচিত্র ধরনের সাহিত্য রীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখক এখানে সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতার দিকটি এবং সাহিত্যের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সম্পর্কে এই লেখায় একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'সাহিত্যের রূপ-রীতি' প্রবন্ধ পাঠ শেষে আপনি–

- সাহিত্যের প্রধান পাঁচটি শাখার পরিচয় লিখতে পারবেন।
- সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলোর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কবিতা ও নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় দিতে পারবেন।
- কবিতা ও নাটকের প্রধান ভাগগুলোর বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয়। আমরা সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য' বলি বটে, কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য, পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ করে হৃদয়ঙ্গম করি। সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বুঝে থাকি, যেমন– কবিতা, মহাকাব্য, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি। আর 'রীতি' হলো ঐ শাখাগুলো কীভাবে নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা।

কবিতা

ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ পদ্যে, যা লিখিত হয় তাকেই আমরা 'কবিতা' বলে থাকি। কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো– মহাকাব্য ও গীতিকবিতা। বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যে। মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনি অবলম্বন করে। ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনির একটি হলো 'রামায়ণ' আর অন্যটি 'মহাভারত'। 'মহাভারত' সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে', এর অর্থ : 'মহাভারত' গ্রন্থে যা নেই তা ভারতবর্ষেও নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না। 'মহাভারত' আয়তনে বিশাল। 'রামায়ণ' তার তুলনায় ক্ষুদ্র; কাহিনি হলো : পত্নী সীতাকে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস, তাঁদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; বনবাসে থাকার সময়ে লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণ তার বোন শূর্পনখার সম্মান রক্ষার জন্য সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগান বাড়িতে বন্দী করে রাখে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটিই রামায়ণ-কথা। অর্থাৎ এককথা, মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনি-কবিতা। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা, তবে তাকে গদ্যে না লিখে পদ্যে লিখতে হয়। এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা, যা 'গীতিকবিতা' হিসেবে পরিচিত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও তা তাঁর প্রধান সৃষ্টিকর্ম নয়। তিনি বলেছিলেন : 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফূটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। গীতিকবিতা কবির অনুভূতির প্রকাশ হওয়ায় সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যদি দীর্ঘও হয় তাতেও অসুবিধে নেই, যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতাবলি।

যদি গীতিকবিতাকে শ্রেণিবিভাজনের অন্তর্গত করতেই হয়, তাহলে এ রকম শ্রেণিবিভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় : ভক্তিমূলক (যেমন- রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, রজনীকান্তের রচনা), স্বদেশপ্রীতিমূলক (যেমন- বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম', রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা-গান), প্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক চিন্তামূলক বা দর্শনাশ্রয়ী কবিতা। শোক-গাথা বা শোক আশ্রয় করে লিখিত কবিতাও এর সমপর্যায়ভুক্ত।

বাংলা কবিতায় বিশেষ দুটি ধারার জনক কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন। প্রথম জন আমাদের সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' ও দ্বিতীয় জন 'পল্লিকবি' হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। নজরুলের কবিতায় যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর ও দৃপ্ত ভাবের দেখা মেলে তা পূর্বে বাংলা কাব্যে ছিল না। জসীম উদ্‌দীনের 'নকশীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' জাতীয় কোনো কাব্য পূর্বে কেউ রচনা করেন নি এবং এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীও কেউ নেই।

নাটক

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মনে রাখা দরকার, নাটক সেকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে (তখন তো ছাপাখানা ছিল না) ঘরে ঘরে পঠিত হত না, নাটক অভিনীত হতো। নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ। তার কারণ সাহিত্যের সকল শাখার ভিতরে নাটকই একমাত্র যা সরাসরি সমাজকে ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন। প্রাচীনকালে সে রকমই প্রথা ছিল। যেমন, শেক্সপীয়রও তাঁর সকল নাটক কবিতায় রচনা করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাব্য দুই ধরনের : দৃশ্যকাব্য ও

শ্রাব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য, সেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভবপর না হলে নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

নাটক সচরাচর পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত থাকে : ১. প্রারম্ভ, ২. প্রবাহ (অর্থাৎ কাহিনির অগ্রগতি), ৩. উৎকর্ষ বা Climax, ৪. গ্রন্থিমোচন (অর্থাৎ পরিণতির দিকে উত্তরণ), ৫. উপসংহার।

কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটককে প্রধানত ***ট্র্যাজেডি*** (Tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক), ***কমেডি*** (Comedy বা মিলনান্ত নাটক) এবং প্রহসন (Farce)– এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এদের মধ্যে ট্র্যাজেডিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। ট্র্যাজেডির ভিতরে দুইটি অংশ ক্রিয়াশীল থাকে : পণ্টট (Plot বা নাটকের আখ্যানভাগ), চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, চিন্তা বা জীবনদর্শনের পরিস্ফুটন, মঞ্চায়ন, সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে সুরসঙ্গতি। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যবেত্তা আরিস্টটল বলতে চেয়েছেন, রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনির দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্র্যাজেডি।

কমেডি বিষয়ে আরিস্টটলের বক্তব্য এ রকম : মানবচরিত্রের যে কৌতুকপ্রদ দিক কাউকে পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তা-ই কমেডির উপজীব্য। এই কৌতুকের জন্ম ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তিযোগের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের বা কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতির মধ্যে। কমেডি আমাদের মানবসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতি ও নির্বুদ্ধিতার পরিণাম প্রদর্শন করে অশোভন দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে।

শ্রেণিবিন্যাসের বিবেচনায় নাটককে বহু শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন–ধ্রুপদী (বা ক্ল্যাসিক্যাল) নাটক, রোম্যান্টিক নাটক। অথবা ধরা যাক- কাব্যধর্মী নাটক, সামাজিক নাটক, চক্রান্তমূলক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন। এসব ব্যতিরেকেও হতে পারে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চরিতনাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ, সাঙ্কেতিক নাটক, সমস্যাপ্রধান নাটক, একাঙ্কিকা ইত্যাদি। ট্র্যাজেডি ও কমেডি-মোটা দাগে এই দুইটি বিভাজন তো রয়েছেই।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেলের লেখনীতেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসন বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়। তারপর দীনবন্ধু আবির্ভূত হন সামাজিক নাটক নিয়ে। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) একইসঙ্গে নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। তিনি পৌরাণিক নাটক ('জনা', 'বুদ্ধদেব'), ঐতিহাসিক নাটক ('কালাপাহাড়'), সামাজিক নাটক ('প্রফুল্ল') ইত্যাদি রচনা করেছেন।

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'শাজাহান' বাঙালি দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়। তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উল্লেখযোগ্য। আর তার পরেই আবির্ভাব কবি রবীন্দ্রনাথের, যিনি বাংলা নাটকেরও মোড় ঘুরিয়ে দেন নানা দিকে : রক্তকরবী, ডাকঘর, অরূপরতন প্রতীকধর্মী নাটক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হয়ে রয়েছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)– জন্ম ঢাকায় ১৮৭১ এর ২০ অক্টোবর এবং মৃত্যু লখ্‌নৌ শহরে ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যারিস্টারি পাস করে স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। সংগীত রচনার জন্য বাঙালির সংস্কৃতিজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গান অদ্যাবধি জনপ্রিয়। **অনুগামী–** অনুসরণকারী; সহচর; সহযাত্রী। **অভিব্যক্তি–** প্রকাশ; বিকাশ। ***অরূপরতন–*** রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক। ***এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌– (১৮৬৬-১৯৪৬)***– ইংরেজ ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক; বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির স্রষ্টা। ***একাঙ্কিকা–*** এক অঙ্কের নাটক। ***এড্‌গার্‌ অ্যালান পো*** (১৮০৯-৪৯)– আমেরিকার কবি; গল্পকার ও সমালোচক। ***এরিস্টোট্‌ল্‌ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ)***– গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যতাত্ত্বিক; দার্শনিক পেণ্টটোর শিষ্য ছিলেন। ***কপালকুণ্ডলা–*** ঊনবিংশ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস; উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে নায়িকার নামে। ***কালাপাহাড়–*** একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। হিন্দুধর্মবিদ্বেষী এক সেনাপতি; তিনি দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। ***গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)–*** বাংলা নাটকের যুগন্ধর পুরুষ। নাট্যরচনার পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন। **গীতিকবিতা–** আত্মনিষ্ঠ

কবিতা। ***চন্দ্রগুপ্ত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নৃপতি; রাজত্বকাল ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দ; কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) বিখ্যাত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। ***চন্দ্রশেখর–*** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস। **ছন্দোবদ্ধ–** ছন্দে রচিত। ***জনা–*** পৌরাণিক নাটক। ***ডাকঘর–*** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক। ***তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)–*** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। ***দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)–*** কবি, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতা; তাঁর 'শাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। **পদ্য–** ছন্দবদ্ধ রচনা; ছন্দযুক্ত বাক্য বা শ্লোক। **পরিস্ফুটন–** স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; সুস্পষ্ট। **প্রশমিত–** নিবারিত; শান্ত; দমিত। **বনবাস–** অরণ্যে নির্বাসন। **ভাবোচ্ছ্বাস–** ভাব বা আবেগের প্রাবল্য। **মহাকাব্য–** পুরাণ বা ইতিহাস থেকে বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত দেবতা, রাজা বা বীরকে নায়ক করে বিশেষ নিয়মে ও রীতিতে রচিত কাব্য, যে কাব্যে জীবন ও জগৎ ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়। ***মেঘনাদ-বধ–*** কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। ***মহাভারত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। **রথ–** প্রাচীন অশ্বাদি বাহিত যান; প্রাচীন যুদ্ধ শকট বা যান। ***রামায়ণ–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। ***লঙ্কা দ্বীপ–*** সিংহল দ্বীপ; বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। **হরণ–** চুরি; বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া।

সারসংক্ষেপ :

সাহিত্যের রূপ বলতে বোঝায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা। আর রীতি হল বিভিন্ন শাখার রচনাশৈলী। কবিতা সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর প্রধান ভাগ দুটি: মহাকাব্য আর গীতিকবিতা। মহাকাব্যে সাধারণত একটি দীর্ঘ কাহিনি আর অসংখ্য খণ্ডকাহিনি ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করা হয়। গীতিকবিতায় থাকে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। নাটক অতি প্রাচীন সাহিত্যরূপ। ট্র্যাজেডি, কমেডি আর প্রহসন এর তিন প্রধান ভাগ। মঞ্চে দর্শকদের জন্য উপস্থাপনই নাটকের মূল লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি?
ক. সৃজনশীলতা খ. গতানুগতিকতা গ. হাস্যরস ঘ. করুণ রস

২. মানব চরিত্রের যে দিকটি হাস্যরসের সৃষ্টি করে তা যার উপজীব্য–
ক. গ্রুপ থিয়েটার খ. কমেডি গ. প্রহসন ঘ. ক্যাম্পু থিয়েটার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গীতিকবিতায় কবি হৃদয়ের বিশেষ অনুভূতি অনবদ্যরূপে ফুটে ওঠে। কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি এর উপজীব্য, সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ।

৩. উদ্দীপকটি আপনার পঠিত কোন রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. বাঙলা শব্দ খ. সাহিত্যের রূপ ও রীতি গ. বাঁধ ঘ. পালামৌ

৪. উদ্দীপক ও 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধ অনুযায়ী গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য–
i. কবির হৃদয়ের অনুভূতি ii. সমাজ চিত্র iii. কাহিনির রূপায়ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছোটগল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধের রূপ-রীতির পরিচয় লিখতে পারবেন।
- ছোটগল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধের বিভিন্ন ভাগের বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছোটগল্প :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যা বলেছিলেন সে-কথাটি ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। তিনি লিখেছিলেন :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

'শেষ হয়ে হইল না শেষ'– কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথার ভিতরেই বলে দেওয়া হলো যে, ছোটগল্প কখনোই কাহিনির ভিতরে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেয় না– যেমনটা ঘটে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে 'ছোটগল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বেশি নয়। তার পূর্বে শুধু 'গল্প' বলা হতো। বড়ো আকারের গল্প হলে 'উপন্যাসিকা' কথা চল ছিল, অর্থাৎ ছোট উপন্যাস। সাহিত্যের যত শাখা আছে, যেমন কাব্য মহাকাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদি, সে-সবের মধ্যে ছোটগল্পই হচ্ছে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। ছোটগল্পেও থাকে উপন্যাসের মতোই কোনো-না-কোনো কাহিনির বর্ণনা, তবে তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নয়, কাহিনির ভিতরে থেকেই বেছে নেওয়া কোনো অংশ থাকে মাত্র।

ইংরেজি সাহিত্যের উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলায় যেমন উপন্যাস লিখিত হয়েছে, ছোটগল্পেরও অনুপ্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই। 'ছোটগল্প' বলতে কোন ধরনের কাহিনি বোঝাবে সে বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ছোটগল্পকার এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) মনে করতেন আধ ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই 'ছোটগল্প'। ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বলতেন যে ছোটগল্পের আয়তন এমন হওয়া সঙ্গত যেন ১০ থেকে ৫০ মিনিটের ভিতরে পড়া শেষ হয়। ইংরেজি ভাষায় পো-কে ছোটগল্পের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি লিখেছেন : In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. ... undue brevity is just as exceptional here as in the poem, but undue length is yet more to be avoided.

বলাই বাহুল্য, উপন্যাসে যেমন বিস্তারিতভাবে কাহিনি বর্ণনা থাকে, ছোটগল্পের পরিধি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন সেখানে সম্ভব নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সাহিত্য গবেষক শ্রীশচন্দ্র দাশ যথার্থই বলেছেন : 'আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোট হইবে বলিয়া ইহাতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকিতে পারে না, জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই ইহার সার্থকতা। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কেমন ভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা তাহারই রূপায়ণ। আকারে ছোট বলিয়া এখানে বহু ঘটনা-সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড় সম্ভবপর নহে। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহার নাটকীয় হওয়া চাই। সত্য কথা বলিতে কি, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোথায় সমাপ্তির রেখা টানিতে হইবে, এই শিল্পদৃষ্টি যাহার নাই তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্ছনা বই কিছুই নহে।' বাংলা ভাষায় সার্থক ছোটগল্পকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছোটগল্প বহুপ্রকার হতে পারে। সাধারণত শ্রেণিবিভাগ হিসেবে এগুলোকে উল্লেখ করা যায় : ১. প্রেমবিষয়ক, ২. সামাজিক, ৩. প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে, ৪. অতিপ্রাকৃত কাহিনি, ৫. হাস্যরসাত্মক, ৬. উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী, ৭. সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী, ৮. ঐতিহাসিক, ৯. বিজ্ঞানভিত্তিক, ১০. গার্হস্থ্য বিষয়ক, ১১. মনস্তাত্ত্বিক, ১২. মনুষ্যেতর

প্রাণিজগৎ, ১৩. বাস্তবনিষ্ঠ, ১৪. গোয়েন্দাকাহিনি বা ডিটেকটিভ গল্প, ১৫. বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প। আমাদের জন্য গর্বের বিষয় এটাই যে, বাংলা ভাষায় উপরোক্ত সব ক'টি শ্রেণির গল্পই বাঙালি গল্পলেখকবৃন্দ লিখে গেছেন ও এখনো লিখছেন।

উপন্যাস

সাহিত্যের শাখা প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। শুধু তাই নয়, পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে এবং কাহিনিটি গদ্যে লিখিত হয়। কিন্তু পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন কাহিনি পদ্যে লেখা হতো; তখন অবশ্য তাকে উপন্যাস বলা হতো না। যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সব ধরনের মঙ্গলকাব্যই ছন্দে রচিত এবং তাতে গল্প বা কাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে, তবু তাকে উপন্যাস না বলে কাব্যই বলা হতো– যেহেতু কবিতার ন্যায় তা ছন্দে রচিত হয়েছে। উপন্যাস রচিত হয় গদ্যভাষায়, এই তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দোবদ্ধ রচনার অনেক পরে যেহেতু গদ্যের আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গদ্যে কাহিনি লেখা হয়েছে, যেমন- গল্প বা ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যকাহিনি ইত্যাদি। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো পণ্টট (Plot)। ঐ পণ্টট বা আখ্যানভাগ তৈরি হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভিতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ও কালজয়ী (এবং অনেকের মতে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিম উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি কালজয়ী কথাসাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝি। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে যেখানে যত বাঙালি রয়েছে তাদের ভিতরে শরৎচন্দ্রই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পঠিত ও জনপ্রিয়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে অবশ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সমরেশ বসু, শহীদুল্লা কায়সার, আবু ইসহাক, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ বিভিন্ন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উপন্যাস বহু রকমের হতে পারে। যেমন– ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, মনোবিশেণ্টষণধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁরই মতো বহু ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছিলেন– যেমন মাধবী-কঙ্কণ, রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত ইত্যাদি।

তবে তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বাঙালি পাঠকসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে জয় করে নেন, তার সমকক্ষ আর কাউকে দেখা যায় না।

প্রবন্ধ

আমরা সকলেই অস্পষ্টভাবে বুঝি 'প্রবন্ধ' কাকে বলে বা কী রকম। গদ্যে লিখিত এমন রচনা যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। কোনো সন্দেহ নেই, এ জাতীয় লেখায় তথ্যের প্রাধান্য থাকবে যার ফলে অজ্ঞাত তথ্যাদি পাঠক জানতে পারবে। ধরা যাক, সংবাদপত্রের যাবতীয় খবরাখবর-দেশের, বিদেশের, মহাকাশের ইত্যাদি। সবই গদ্য ভাষায় রচিত এবং যার লক্ষ্য পাঠকের অজানা বিষয় পাঠককে জানানো। গদ্যসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও তথ্যবহুল রচনা হলেই তাকে প্রবন্ধসাহিত্যের উদাহরণরূপে গণ্য করা চলবে না, যদি-না লেখাটি সাহিত্য পদবাচ্য হয়। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা। লেখকের সৃজনীশক্তির কোনো পরিচয় যদি পরিস্ফূটিত না হয়, তো তেমন কোনো লেখাকে প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে না। এ-কারণে খবরের কাগজে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই গদ্যে রচিত হলেও তাদেরকে প্রবন্ধসাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। তাহলে তো জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল রচনাই প্রবন্ধসাহিত্য বলে গণ্য হতে পারত। তা না হওয়ার কারণ ঐ সৃজনশীলতার অভাব।

মনে রাখা প্রয়োজন : সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য– সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধের সেই একই উদ্দেশ্য। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য নানা রকম হতে পারে ঠিকই, তবে তা গদ্যে ও নাতিদীর্ঘ আকারে লিখিত হয়।

প্রবন্ধের দুটি মুখ্য শ্রেণিবিভাগ আছে : তন্ময় (objective) প্রবন্ধ ও মন্ময় (subjective) প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে-সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় সেগুলোকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তাপ্রধান সৃষ্টি। এ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

আরেক শ্রেণির রচনাও সম্ভব যেখানে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। এদেরকে মন্ময় প্রবন্ধ বলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্যায়ের। ফরাশি ভাষায় বেল্ লেৎর্ (belle letre) বলে একটি শব্দ আছে, ইংরেজিতেও বেল্ লেৎর্ই বলে। এর বাংলা নেই। বাংলায় বলা যেতে পারে চারুকথন। বেল্ শব্দের অর্থ-সুন্দর, চমৎকার। আর লেৎর্ অর্থ– letter, অক্ষর। বেল্ লেৎর্ মন্ময় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির সকল রচনাই এ জাতীয় মন্ময় প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। অনেকে এ ধরনের লেখাকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলারও পক্ষপাতী। 'রম্য রচনা' নামে একটা কথা অনেক দিন যাবত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বোঝাতে 'রম্য রচনা' ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ 'রম্য রচনা' শব্দদ্বয়ের 'রম্য' শব্দের ভিতরে এমন ইঙ্গিত রয়ে যায় যে, লেখাটি সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে নয়, অথচ রম্যরচনার বিষয় খুবই গুরুগম্ভীর হতে পারে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা গুরুগম্ভীর হলে চলবে না।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য আয়তনে বিশাল এবং গুণগত মানে অতি উত্তম। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তার প্রবহমাণতা কখনো ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আবু ইসহাক– (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। **উপজীব্য–** জীবিকার বা প্রয়োজনের জন্য গ্রহণযোগ্য। ***দৃশ্যকাব্য–*** প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হত। ***দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)–*** বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা লেখক; 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) তাঁর সর্বাধিক খ্যাত নাটক, 'সধবার একাদশী' তাঁর বিখ্যাত প্রহসন। ***নকশীকাঁথার মাঠ–*** পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত আখ্যান কাব্য। ***নীলদর্পণ–*** দীনবন্ধু মিত্রের নাটক; দেশের তৎকালীন শাসনকর্তা ব্রিটিশদের হুকুমে বাধ্যতামূলক নীলচাষ করানোর সমালোচনা করে এই নাটক রচিত হয়েছিল। **প্রামাণ্য–** বিশ্বাসযোগ্য; দলিলসিদ্ধ। ***প্রফুল্ল–*** নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা নাটক। ***প্রহসন–*** উপন্যাস বা নাটকের রচনাশৈলী অবলম্বনে হাস্যরসাত্মক রচনা। ***প্লট–*** গল্প, উপন্যাস বা নাটকের কাহিনিসজ্জাকে পণ্টট বলা হয়। ***পৌরাণিক নাটক–*** পুরাণের কোনো কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। ***বনফুল–*** গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বা লেখক নাম। ***বন্দে মাতরম–*** এই দু শব্দের অর্থ জননীকে অর্থাৎ মাকে বন্দনা করি; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে স্বরচিত এই গানটি যুক্ত করেছেন। ***বিচিত্র প্রবন্ধ–*** রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। ***বিষবৃক্ষ–*** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। ***বৈষ্ণব কবিতা–*** মধ্যযুগের বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিকবিতা ও গান। ***মঙ্গলকাব্য–*** বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত এক ধরনের কাহিনি-কাব্য। ***মহাভারত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে দুটি মহাকাব্যের একটি, অন্যটি রামায়ণ, মূল রচনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, কয়েকশত বৎসর পরে বাংলায় অনূদিত হয়। ***মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত–*** উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***মাধবী কঙ্কণ–*** রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত উপন্যাস। ***মেঘনাদবধ কাব্য–*** কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। ***রক্তকরবী–*** রবীন্দ্রনাথ রচিত সাংকেতিক নাটক। ***রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)–*** সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ***রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)–*** কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বাঙালি কমিশনার এবং খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***রাজপুত জীবনসন্ধ্যা–*** রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩৪)–*** পণ্ডিমবঙ্গের হুগলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের শিল্পী। 'বেদন্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ***রামপ্রসাদ সেন (আনু: ১৭২৩-৮১)–*** কবি ও সংগীত রচয়িতা; ভক্তিগীতি রচনার জন্য বিখ্যাত; এঁর গানকে 'রামপ্রসাদী' আখ্যা দেওয়া হয়। ***শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১)–*** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহিদ হন। ***শাজাহান–*** নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রচিত নাটক। ***শ্রাব্যকাব্য–*** যে কাব্য পড়া ও শোনার জন্য রচিত, এর বিপরীতে রয়েছে দৃশ্যকাব্য। ***শ্রীশচন্দ্র দাস–*** 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থের রচয়িতা; বইটি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (যেমন– গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থ। ***শূর্পণখা–*** রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনিতে লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। ***শেক্সপীয়র–*** ইংরেজি কবি ও নাট্যকার। ***সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ–*** প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পুরনো আমলে যাঁরা আলোচনা করেছেন বা বইপত্র লিখেছেন। ***সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)–*** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। ***সীতা–*** পৌরাণিক চরিত্র; রামচন্দ্রের স্ত্রী; লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণের বিরুদ্ধে রাম যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'সীতা' ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ***সোজনবাদিয়ার ঘাট–*** পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত কাহিনীকাব্য। ***হাসান আজিজুল হক–*** জন্ম ১৯৩৯ সালে, বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাশিল্পী।

সারসংক্ষেপ :

ছোটগল্প সাহিত্যের নবীনতম শাখা। ছোটগল্পে সাধারণভাবে একটি বাহুল্যবর্জিত ছোট কাহিনি উপস্থাপিত হয়। ভাবের দিক থেকেও তা একমুখী। অন্যদিকে উপন্যাসে থাকে লম্বা কাহিনি। কাহিনিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাস জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করতে চায়। ছোটগল্প ধরতে চায় একটি মুহূর্তকে; আর উপন্যাসের লক্ষ্য বিস্তৃত জীবন। প্রবন্ধ অন্য চারটি সাহিত্যরূপ থেকে আলাদা। এতে কল্পনার প্রাধান্যও থাকে না, কাহিনিও থাকে না। তথ্য ও বিশ্লেষণে সাজিয়ে প্রবন্ধে লেখক নিজের চিন্তা, মনোভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করতে চান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধ–

ক. রম্যরচনা　　খ. মন্ময় প্রবন্ধ

গ. তন্ময় প্রবন্ধ　　ঘ. অভিসন্দর্ভ

৬. উপন্যাস জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেন?

ক. গদ্যে রচিত　　খ. পদ্যে রচিত　　গ. সুখপাঠ্য　　ঘ. মনোগ্রাহী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছোটগল্পের শুরুটা হয় নাটকীয়। আবার এর শেষটাতে রয়ে যায় অতৃপ্তি।

৭. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে?

ক. কবিতা　　খ. উপন্যাস　　গ. মহাকাব্য　　ঘ. ছোটগল্প

৮. উদ্দীপক এবং 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে মিল রয়েছে ছোটগল্পের যে বিষয়টিতে–

i. গঠনরীতিতে　　ii. শিল্পরীতিতে　　iii. সমাজ চিত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　খ. ii　গ. iii　ঘ. i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই' গ্রন্থটির লেখক কে?

ক. হায়াৎ মামুদ　　খ. কবির মামুদ　　গ. কবীর চৌধুরী　　ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১০. বিষয়বস্তু ও ভাবগত দিক দিয়ে গীতিকবিতা–

i. কবির লিপিকুশলতা　　ii. কবির অভিব্যক্তি　　iii. কবির মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i　গ. ii　ঘ. iii

১১. 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।' –মন্তব্যটি করা হয়েছে সাহিত্যের যে রূপ সম্পর্কে–

ক. প্রবন্ধ খ. গীতি কবিতা গ. ছোটগল্প ঘ. মহাকাব্য

১২. 'জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই উহার সার্থকতা।' –উদ্দীপক এবং 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধ অনুসারে উক্তিটি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

ক. মহাকাব্য খ. ছোটগল্প গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সমালোচকের মতে ছোটগল্পে মানব জীবনের ছোট ছোট দুঃখ কথা থাকে। এতে বর্ণনার ছটা নেই, থাকে না ঘটনার ঘনঘটা। জীবনের গূঢ় তত্ত্ব কিংবা উপদেশেরও কোন বালাই নেই ছোটগল্পে। ছোটগল্প পাঠ শেষে অন্তরে অতৃপ্তি রয়ে যাবে এবং মনে হবে যেন শেষ হয়েও শেষ হল না।

ক. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা কে?

খ. 'প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা।' –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে নয় একটি মাত্র অংশকে তুলে ধরেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

ট্র্যাজেডি রসের দিক হতে বিশেষ ধরনের নাটক। এ জাতীয় নাটকে নায়কের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে অনর্থ এসে পড়ে। কখনো দৈব বা অদৃষ্ট-পীড়িত হয়ে তাকে কালগ্রাসে পতিত হতে হয়। নাট্যকার বিশেষ গুরুগম্ভীর বাণীভঙ্গিতে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনাকে রূপ দান করেন। নায়ক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে, একদিকে তাঁর আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, অপর দিকে বাইরের ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্যের নাম কী?

খ. 'নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য'– বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটিতে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?

ঘ. 'উদ্দীপকে সব ধরণের নাটক নয়, কেবল একটি বিশেষ শ্রেণির নাটকের বর্ণনা রয়েছে।' –'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে লেখক পাঠকের কাছে প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বিষয়কে নির্দেশ করেছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য,শিল্পকলা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে যেসব তত্ত্বকেন্দ্রিক, বস্তুগত ও চিন্তামূলক গদ্য নিবন্ধ রচিত হয় সেগুলোকে প্রবন্ধ সাহিত্য বলে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। প্রবন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তি হৃদয়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। অজানা তথ্য সম্পর্কে পাঠক মনে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মূলত তা পূরণ করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের অন্যতম রূপ ছোটগল্পকে নির্দেশ করে।

মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের নবীন অতিথি তথা আধুনিককালের সৃষ্টি। তবে দেশীয় গল্পকারদের হাতে এটি অল্প সময়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শাখায় পরিণত হয়েছে।

উদ্দীপকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি হবে ব্যঞ্জনাময়, অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে একটা অতৃপ্তির বেদনাবোধ জন্ম নেয়। পাঠক চিন্তায় পড়ে যান, এর পরে যেন কী হয়? এই যে একটি আক্ষেপ তাই ছোটগল্পের প্রাণ। উদ্দীপকে বলা হয়েছে গূঢ় তত্ত্ব কিংবা উপদেশেরও কোন বালাই নেই ছোটগল্পে; শেষ হয়েও শেষ হয় না। গল্পের পাঠক প্রশ্নের উত্তর

না পাওয়ার আগেই পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এটিকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের সকল শাখার প্রতিনিধিত্ব করে না।

সাহিত্য মানব জীবনের চিত্র। এই চিত্র রূপায়ণে এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন– কবিতা, ছোটগল্প, মহাকাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। শুধু ছোটগল্প বা মহাকাব্য নয় সাহিত্যের রয়েছে নানা স্তর। এগুলোও আবার নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। সাহিত্য যেন বটবৃক্ষের মত ছায়া বিস্তার করে পাঠকের মনোরঞ্জন করে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয় বলে তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে ছোটগল্প ছাড়াও কবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির রূপ-রীতির সুস্পষ্ট বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। সাহিত্যের কোনো শাখা অন্য শাখার সাথে মিলে না। প্রত্যেক শাখার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানব জীবনে ছোট ছোট দুঃখ-কথা থাকে; বর্ণনার ছটা নেই; অন্তরে অতৃপ্তি রয়ে যাবে; শেষ হয়েও শেষ হবে না– এগুলো ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে শুধু ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার নাম, সংজ্ঞার্থ, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, বিশেষ বিশেষ সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যের ফর্ম লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। এতে শুধু গল্পের আলোচনা প্রাধান্য পায়নি, সাহিত্যের অন্যান্য রূপও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকটি কেবল ছোটগল্পকেই নির্দেশ করেছে। তাই বলা যায় মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

ক. বেল্ লেৎর্ (belle letre) কী?
খ. 'ঔপন্যাসিকা' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে গীতিকবিতার যে বিষয়টি প্রকাশিত করে তা আলোচনা করুন।
ঘ. "'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে আলোচিত গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. খ

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

বাঙলা শব্দ

হুমায়ুন আজাদ

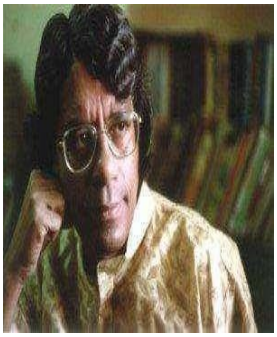

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রাশেদ ও মা জোবেদা খাতুন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত। রাড়িখালের স্যার জে সি বোস ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ুন আজাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক মননশীল লেখক। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা তাঁর সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। গতানুগতিক চিন্তাধারা তিনি সচেতনভাবে পরিহার করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০টিরও বেশি। তিনি বাংলা একডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট জার্মানির মিউনিখে মৃত্যুবরণ করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

কাব্যগ্রন্থ : *অলৌকিক ইস্টিমার, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু*;
উপন্যাস : *ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল, সব কিছু ভেঙে পড়ে, একটি খুনের স্বপ্ন*;
গল্পগ্রন্থ : *যাদুকরের মৃত্যু*;
প্রবন্ধ-গবেষণা : *নারী, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, বাক্যতত্ত্ব, লাল নীল দীপাবলি, কতো নদী সরোবর*;

ভূমিকা

'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখক এখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ এবং অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়া এ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- বিভিন্ন প্রকার বাংলা শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাঙলা ভাষার এক রকম শব্দকে বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ'। আরেক রকম শব্দকে বলা 'তৎসম শব্দ'। এবং আরেক রকম শব্দকে বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। এ-তিন রকম শব্দ মিলে গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার শরীর। 'তৎসম', 'তদ্ভব' পারিভাষিক শব্দগুলো চালু করেছিলেন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা। তাঁরা 'তৎ' অর্থাৎ 'তা' বলতে

বোঝাতেন 'সংস্কৃত' (এখন বলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য) ভাষাকে। আর 'ভব' শব্দের অর্থ 'জাত, উৎপন্ন'। তাই 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো 'সংস্কৃত থেকে জন্ম নেয়া', আর 'তৎসম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সংস্কৃতের সমান' অর্থাৎ সংস্কৃত। বাঙলা ভাষার শব্দের শতকরা বায়ান্নটি শব্দ 'তৎভব' ও অর্ধতৎসম'। শতকরা চুয়াল্লিশটি 'তৎসম'। তাই বাঙলা ভাষার শতকরা ছিয়ানব্বইটিই মৌলিক বা বাঙলা শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের স্রোতে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাঙলা শব্দে। এগুলোই তদ্ভব শব্দ। এ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাঙলা ভাষা। তবে তদ্ভব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসে নি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই এসেছে বেশি সংখ্যক শব্দ।

'চাঁদ', 'মাছ', 'এয়ো', 'দুধ' 'বাঁশি'। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নিয়ম মেনে প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে এসেছে বাঙলায়। 'চাঁদ' ছিলো সংস্কৃতে 'চন্দ্র', প্রাকৃতে ছিলো 'চন্দ'। বাঙলায় 'চাঁদ। 'মাছ' ছিলো 'মৎস' সংস্কৃতে, প্রাকৃতে হয় 'মচ্ছ'। বাঙলায় 'মাছ'। 'এয়ো' ছিলো সংস্কৃতে 'অবিধবা'। প্রাকৃতে হয় 'অবিহবা'। বাঙলায় 'এয়ো'। 'দুধ' ছিলো সংস্কৃতে 'দুগ্ধ"; প্রাকৃতে হয় 'দুদ্ধ'। বাঙলায় হয় 'দুধ'। 'বাঁশি ছিলো 'বংশী' সংস্কৃতে। প্রাকৃতে হয় 'বংসী'। বাঙলায় 'বাঁশি'। বেশ নিয়ম মেনে, অনেক শতক পথ হেঁটে এসেছে এ-তীর্থযাত্রীরা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা।

আরো আছে কিছু তীর্থযাত্রী, যারা পথ হেঁটেছে আরো বেশি। তারা অন্য ভাষার। তারা প্রথমে ঢুকেছে সংস্কৃতে, তারপর প্রাকৃতে। তারপর এসেছে বাঙলায়। এরাও তদ্ভব শব্দ। মিশে আছে বাঙলা ভাষায়।

'খাল' আর 'ঘড়া'। খুব নিকট শব্দ আমাদের। 'খাল' শব্দটি তামিল ভাষার 'কাল' থেকে এসেছে। 'কাল' সংস্কৃতে হয় 'খল্ল'। প্রাকৃতে হয় 'খল্ল'। বাঙলায় 'খাল'। তামিল-মলয়ালি ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'কুটম'। সংস্কৃতে সেটি হয় ঘট। প্রাকৃতে হয় 'ঘড়'। বাঙলায় 'ঘড়া'।

'দাম' আর 'সুড়ঙ্গ'। প্রতিদিনের শব্দ আমাদের। 'দাম' শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার 'দ্রাখ্‌মে' (একরকম মুদ্রা, টাকা) থেকে। 'দ্রাখ্‌মে' সংস্কৃতে হয় 'দ্রম্য'। প্রাকৃতে 'দম্ম'। বাঙলায় 'দাম'। গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'সুরিংক্‌স্‌'। শব্দটি সংস্কৃতে ঢুকে হয়ে যায় 'সরঙ্গ'/সুরুঙ্গ'। প্রাকৃতেও এভাবেই থাকে। বাঙলায় হয়ে যায় 'সুড়ঙ্গ'।

'ঠাকুর'। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ কবির নামের অংশ। শব্দটি ছিলো তুর্কি ভাষায় 'তিগির'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে হয়ে যায় 'ঠক্কুর'। বাঙলায় 'ঠাকুর'।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষয় অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাঙলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। বাঙলা ভাষায় এমন শব্দ অনেক। তবে এ-শব্দগুলো যে একেবারে বদলায় নি, তাও নয়। এদের অনেকে পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু আমরা সে-পরিবর্তিত রূপগুলোকে বাদ দিয়ে আবার খুঁজে এনেছি খাঁটি সংস্কৃত রূপ।

জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, দর্শন, দৃষ্টি, বংশী, চন্দ্র এমন শব্দ। এদের মধ্যে 'বংশী' ও 'চন্দ্র'র তদ্ভব রূপও আছে বাঙলায়। 'বাঁশি' আর 'চাঁদ'। পুরোনো বাঙলায় 'সসহর' ছিলো, 'রএণি' ছিলো। এখন নেই। এখন আছে সংস্কৃত শব্দ 'শশধর' আর 'রজনী'। বাঙলা ভাষার জন্মের কালেই প্রবলভাবে বাঙলায় ঢুকতে থাকে তৎসম শব্দ। দিন দিন তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে তৎসম শব্দ বাঙলা ভাষাকে পরিণত করে তার রাজ্যে।

কিছু শব্দ বেশ রুগ্নভাবে এসেছে বাঙলায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতের কিছু শব্দ কিছুটা রূপ বদলে ঢুকেছিলো প্রাকৃতে। তারপর আর তাদের বদল ঘটে নি। প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে সেগুলো এসেছে বাঙলায়। এগুলোকেই বলা হয় অর্ধতৎসম। 'কৃষ্ণ' ও 'রাত্রি' বিকল হয়ে জন্মেছে 'কেষ্ট' ও 'রাত্তির'। শব্দগুলো বিকলাঙ্গ। মার্জিত পরিবেশে সাধারণত অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূল নির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয় যে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের আগে যে সব ভাষা ছিলো আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকে এসেছে ওই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় 'দেশি' শব্দ। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতোই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকেও গ্রহণ করা উচিত বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী ক'রে বিদেশি বলি?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিকশিতভাবে– বিকশিত নয় এমন। **অটল–** স্থির। ***অর্ধতৎসম শব্দ–*** অর্ধেক তার সমান; তৎসম শব্দের আংশিক পরিবর্তিত রূপ। ***আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা–*** বাংলাভাষায় আগত শব্দসমূহ আমাদের বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ কারণে আগত শব্দসমূহকে লেখক সবচেয়ে প্রিয় বলে বিশেষায়িত করেছেন। ***এ-তীর্থযাত্রীরা–*** এখানে বাংলা ভাষায় আগত শব্দভান্ডারকে বোঝানো হয়েছে। ***তদ্ভব শব্দ–*** তা থেকে উৎপন্ন; প্রাকৃত বাংলা শব্দ; এই শব্দগুলো প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ক্রম পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে। ***তৎসম শব্দ–*** তৎসদৃশ; তদ্রূপ; সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ। **তীর্থযাত্রী–** পবিত্র স্থানে গমনকারী। ***প্রাকৃত–*** প্রকৃতিজাত; স্বাভাবিক; প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার রূপান্তর বিশেষ। ***বিকলাঙ্গ–*** অঙ্গহীন; ত্রুটিযুক্ত। **ভাষাতাত্ত্বিক–** ভাষার উৎপত্তি বা বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান নিয়ে যিনি আলোচনা করেন। **মার্জিত–** ত্রুটিশূন্য; দোষমুক্ত। **সাবলীল–** সহজ।

সারসংক্ষেপ :

বাংলা শব্দের শতকরা প্রায় ছিয়ানব্বইটি শব্দ তৎসম, তদ্ভব আর অর্ধতৎসম। এগুলোই বাংলা ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার। সংস্কৃত থেকে হুবহু বাংলায় গৃহীত হয়েছে অনেক শব্দ। এগুলোর নাম তৎসম। অল্প কিছু শব্দ খানিকটা বদলে বাংলায় এসেছে। এগুলোকে বলা হয় অর্ধতৎসম। অন্য বিপুল পরিমাণ শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দের রূপ পেয়েছে। এদের নাম তদ্ভব। বিদেশি ভাষার কিছু শব্দও আমরা নানা প্রয়োজনে গ্রহণ করেছি। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলো সম্ভবত পুরনো স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলো দেশি শব্দ নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার অপর নাম কী?
ক. অপভ্রংশ খ. সংস্কৃত
গ. প্রাকৃত ঘ. তামিল

২. বাংলা ভাষার শরীর কত রকম শব্দ দিয়ে গড়ে উঠেছে?
ক. তিন রকম খ. চার রকম গ. পাঁচ রকম ঘ. ছয় রকম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাংলাভাষায় এমন কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়। দেখা যায় ভাষার পরিবর্তনের সময় বিকৃতির মাধ্যমে এদের জন্ম। সাধারণত ভদ্র পরিবেশে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় না।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটি 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধে আলোচিত কোন ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. তৎসম শব্দ খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ গ. দেশি শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ

৪. উদ্দীপক ও 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায় উদ্দীপকে আলোচিত শব্দগুলো–
i. বিকৃতভাবে তৈরি হয়েছে ii. সবার নিকট বোধগম্য নয় iii. ব্যাকরণ সঠিক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'দ্রাখমে' কোন ভাষার শব্দ?
ক. ল্যাটিন খ. গ্রিক গ. সুইডিশ ঘ. ফ্লেমিশ

৬. 'প্রাকৃত শব্দ' যে শব্দের পরিবর্তিত রূপ–

ক. তৎসম শব্দ খ. তদ্ভব শব্দ গ. গ্রিক শব্দ ঘ. দেশি শব্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যে সব শব্দ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে।

৭. উদ্দীপকের ভাব 'বাংলা শব্দ' রচনার যে শব্দগুচ্ছে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. চা, চিনি, চাকু খ. ডাব, ডিঙ্গি, ডাঙ্গা গ. জুডো, জেব্রা, জিরাফ ঘ. আয়া, আতা, আচার

৮. উদ্দীপক ও 'বাংলা শব্দ' রচনায় বাংলা শব্দকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে–

i. গঠন অনুসারে ii. অর্থ অনুসারে iii. উৎপত্তি অনুসারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ওপরের কোনটিই নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

যদিও আমরা এমন বলি না যে, ঘর প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে: কিন্তু আমরা এমন বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা: আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত।

ক. 'লাল নীল দীপাবলি' কী জাতীয় গ্রন্থ?

খ. 'কিছু শব্দ বেশ রুগ্ণভাবে এসেছে বাঙলায়।' –কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটির সাযুজ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. "বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ নিয়ে আলোচনা হলেও উদ্দীপক ও 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভিন্নধর্মী।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. ড. হুমায়ুন আজাদ রচিত 'লাল নীল দীপাবলি' প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার কতগুলো শব্দ লোক মুখে কিছুটা বিকৃত হয়ে তার রূপের খানিকটা পরিবর্তন করে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে। 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে এই শব্দগুলো এভাবেই রুগ্ণভাবে বাংলায় এসেছে।

বাংলা ভাষার মূল উৎস ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা। ভারতে এই শাখার আদিম রূপ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা 'সংস্কৃত ভাষা' সময়ের বিবর্তনে লোকমুখে বিকৃত বা অর্ধবিকৃত হয়ে নিয়মকানুনের ধাপ পেরিয়ে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। তবে কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ রয়েছে যেগুলো আসল রূপ থেকে কিছুটা বদল হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তেমনি ত্রুটিযুক্ত প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত এ শব্দগুলো সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটির সাযুজ্য নেই, রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ এসেছে। সময়ের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে এ ভাষার মহীরূহ। একসময় এ ভাষার মানুষ বাইরে থেকে আসা শব্দগুলো নিজের করে নেয়। বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা থেকে আসা শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো একবারে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

উদ্দীপকে লেখক বলতে চেয়েছেন, অকারণে কঠিন শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাংলা শব্দ; আর গৃহ, মস্তক, পত্র , তাম্র সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। পক্ষান্তরে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের আগমন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার শরীর গঠন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু এক হলেও তাদের উদ্দেশ্য নানাদিক থেকে আলাদা।

বাংলা ভাষায় শব্দের একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় কঠিন শব্দ বাদ দিয়ে সবার বোঝার সুবিধার্থে সহজ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাতে ভাষার গতি ও প্রকৃতি দুটোই রক্ষা করা যায়।

উদ্দীপকে ভাষাকে মধুর করতে সহজ শব্দ ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, মাথার পরিবর্তে মস্তক, পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যদিকে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধ দুটো রচনাতেই বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয়ের বিষয়বস্তু এক হলেও রচনার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কারণ প্রবন্ধে তৎসম শব্দের ব্যবহার করে বাক্যকে গুরুগম্ভীর না করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আর উদ্দীপকে তৎসম শব্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

যে ভাষা বেশি শব্দ গ্রহণ করতে পারে সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। ব্যাকরণবিদদের তথ্য মতে বাংলা ভাষায় মোট শব্দের সংখ্যা সোয়া লক্ষের মতো। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ তৎসম, প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আরবি-ফারসি, চারশত তুর্কি, আটশত ইংরেজি শব্দ এবং দেড়শত রয়েছে পর্তুগিজ ও ফরাসি শব্দ। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে। আর বাকি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় তদ্ভব ও দেশি শব্দ নামে পরিচিত।

ক. 'খাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

খ. 'এ তীর্থ যাত্রীরা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় উদ্দীপকের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. 'বাংলা শব্দের ভাণ্ডার দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।' –উদ্দীপক ও 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. গ

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।